



গবেষণায় হাতেখড়ি

www.adarsha.com.bd



www.adarsha.com.bd



গবেষণায় হাতেখড়ি

রাগিব হাসান

www.adarsha.com.bd





প্রকাশক: আদর্শ

কলকর্ত এম্পেরিয়াম, কাটাবন, ঢাকা ১২০৫

৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০

+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০

info@adarsha.com.bd

www.adarsha.com.bd

গবেষণায় হাতেখড়ি

৩য় সংস্করণ: ১৮ পৌষ ১৪২৬; ১ জানুয়ারি ২০২০

(এ ঘাবৎ কপি ১২.৫০০ কপি মুদ্রিত)

২য় সংস্করণ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৬; ১৪ নভেম্বর ২০১৯

২য় সংস্করণ: ২৩ মাঘ ১৪২২; ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

২য় মুদ্রণ: ১০ ফাল্গুন ১৪২১; ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

১ম প্রকাশ: ২৮ মাঘ ১৪২১; ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

© লেখক

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে
রইটি বা বইটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

প্রচ্ছদ: মানবেন্দ্র গোলদার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স

মূল্য: বাংলাদেশে ২৬০ টাকা

Gobeshanay Hatekhari (Published in Bengali)

by Ragib Hasan

Published by Adarsha

Sale Center: Adarsha Boi

38 P K Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100

ISBN: 978-984-8040-74-4



উৎসর্গ

বাবা মোঃ শামসুল হুদা

ও

মা রেবেকা সুলতানাকে

রাগিব হাসানের প্রকাশিত অন্য বইসমূহ

মন প্রকৌশল: স্বপ্ন অনুপ্রেরণা আর জীবন গড়ার ফরমুলা

বিদ্যাকৌশল: লেখাপড়ায় সাফল্যের সহজ ফরমুলা

বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানা

গবেষণায় হাতেখড়ি বইটির সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল
ও নানা ডকুমেন্ট পড়া বা ডাউনলোড করা যাবে এই সাইটে—

<http://www.elochinta.com>

সূচি

মুখ্যবন্ধ	০৯
দ্বিতীয় সংক্ষরণের ভূমিকা	১১
ভূমিকা	১৩
গবেষণার প্রাথমিক ধারণা	১৭
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গবেষণা	২০
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	২২
গবেষণা বা রিসার্চ যেভাবে করবেন	২৪
গবেষণা শুরুর আগে যা যা শিখে নেবেন	২৬
গবেষণার বিষয় নির্বাচন	৩০
গবেষণার পরিকল্পনা	৩২
যেভাবে গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার পড়বেন	৩৬
রিসার্চ পেপার রিভিউ করবেন যেভাবে	৩৮
রিভিউ বা সার্টে আর্টিকেল লেখা	৪০
আইডিয়া পাবেন যেভাবে	৪৩
আইডিয়াকে চিত্রাকর্ষকভাবে লিখবেন যেভাবে	৪৭
আইডিয়া ও সমাধান যাচাই	৪৯
গবেষণার ফল প্রকাশ	৫২
গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার লিখবেন যেভাবে	৫৫
জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ	৫৮
ভালো প্রেজেন্টেশন বা লেকচার দেবেন যেভাবে	৬১
গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন : প্রেজেন্টেশন ও বক্তৃতা	৬৭
লেখার মান বাড়াবেন যেভাবে	৭১
গবেষণার নৈতিকতা বা এথিকস	৭৫
গবেষণার পরিমাপ	৭৮

গবেষণার খরচ জোগানো	৮০
গবেষকদের অভ্যাস	৮৩
মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ ও সতর্কতা	৮৫
সময় ব্যবস্থাপনা	৮৭
গবেষণার মানসিকতা	৯০
গবেষণার প্রতিবন্ধকতা যেভাবে জয় করবেন	৯৩
গবেষণা-সংক্রান্ত আলাপ বা ইমেইল	৯৬
গবেষক হিসেবে পরিচিতি	৯৯
পিএইচডি ডিগ্রির রোডম্যাপ	১০২
খুদে গবেষকদের জন্য গবেষণা	১০৫
হাতেকলমে গবেষণা	১১০
নবীন গবেষকদের বাড়ির কাজ	১১৩

মুখ্যন্ধ

আমার জীবনের একটি বড় সৌভাগ্য যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের আকর্ষণ করেছে— এমনকি সেই সময় যখন আমাদের শিক্ষক-স্বল্পতা ছিল। তার মধ্যেও আমাদের স্নাতকেরা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বমানের মেধার প্রমাণ রেখে চলেছে।

রাগিব হাসান আমাদের বিভাগ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে। তার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে শুধু ছাত্র হিসেবেই ভালো নয়। তার সমাজ-ভাবনা সবাইকে নিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। কোনো একসময়ে আমার সুযোগ হয়েছিল তার গবেষণা কর্মের সাক্ষী থাকার। তখনই দেখেছি তার গবেষণা করার প্রতিভাই শুধু আছে তা-ই নয়, তার আগ্রহ সীমাহীন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাগিব হাসান পিছপা হয় না। আইআইটি কানপুরের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় কোনো সফলতাহীন অংশগ্রহণের পর তার পরের বছরই যে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সফলতা অর্জন তার চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রমাণ করে, যা যেকোনো গবেষণায় সফলতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

আইনস্টাইন বলেছেন, তিনি খুব তীক্ষ্ণধী নন, তবে একটি সমস্যা নিয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ লেগে থাকতে পারেন। গবেষণায় সফলতা অর্জন করতে যদি কোনো গোপন মূলমন্ত্র থাকে, তা হলো লেগে থাকা। রাগিব অত্যন্ত কর্মী এবং সক্রিয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তার সরব উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া নিজের অধ্যাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত সক্রিয়। ইতিমধ্যে কয়েকজন তরুণ গবেষকের পিএইচডি ডিগ্রির কাজ রাগিব সফলভাবে

তত্ত্বাবধান করেছে। অনলাইনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সবার কাছে বাংলা ভাষায় শিক্ষা পৌছে দিতে রাগিব প্রতিষ্ঠা করেছে শিক্ষক.কম, যা দিয়ে উপকৃত হয়েছে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী।

আমাদের ভূখণ্ডের বিজ্ঞানীরা ঔপনিবেশিক শাসনামলে তাদের বিশ্বমানের গবেষণা-দক্ষতা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আমাদের সেই শ্রেয়তর সক্ষমতা প্রকাশ করতে সমর্থ হইনি। আমাদের জনগনত্ত পৃথিবীর গড় জনগনত্তের ২৪ গুণ বেশি। এর অর্থ হলো ২৪ গুণ কম প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের একটি শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করতে হয়। আর এর জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তির দক্ষতায় আমরা বিশ্বমানের না হলে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যে দুর্জন হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের তরুণেরা রাগিবের এই বই পড়ে গবেষণায় ঝাঁপিয়ে পড়বে— এ প্রত্যাশায় রাগিব হাসানকে তার এই প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২৪ জানুয়ারি, ২০১৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গবেষণায় হাতেখড়ি বইটির কথা মাথায় এসেছিলো কয়েক বছর আগে। পেশাগত জীবনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করার অংশ হিসাবে আমার অধীনে পিএইচডি গবেষণার কাজ শুরু করা ছাত্রদের হাতে কলমে গবেষণা শিখাতে হয়েছিলো। আমি নিজে এই ব্যাপারটা শিখেছিলাম পিএইচডি করার সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপিকা মেরিঅ্যান উইন্সলেটের হাতে। খেয়াল করেছিলাম, ইংরেজিতে এই বিষয়ে অনেক কিছু থাকলেও বাংলা ভাষায় এরকম বই নাই। ফলে বাংলাভাষী একজন শিক্ষার্থী কিংবা গবেষক কীভাবে কী করবেন, তা সহজে বুঝে উঠতে পারেন না। অনেক কিছুই ঠেকে শিখতে হয়। সেজন্যই মাথায় এসেছিলো, কীভাবে গবেষণার পুরো বিষয়টিকে সহজ ভাষায় ও সংক্ষেপে বাংলা ভাষায় লিখতে পারি। প্রতিদিন সকালে ক্লাসে শিক্ষকতা করে ফেরার পরে এই সংক্রান্ত কিছু কথা দ্রুত বাংলায় লিখে ফেইসবুকে প্রকাশ করতে থাকি। আমার ধারণা ছিলো গবেষণার খটোমটো বিষয় নিয়ে মানুষের খুব একটা আগ্রহ হবে না। কিন্তু খুব অবাক হয়ে দেখলাম, প্রচুর মানুষ এই লেখাগুলা মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন, গবেষণার ব্যাপারে তাদের অপার আগ্রহ। তাই এক সময়ে সিঙ্ক্লান্ট নিলাম, সবগুলা লেখা একসাথে করে বই আকারে প্রকাশ করবো। আদর্শর উৎসাহে ২০১৫-এর বইমেলাতে বইটি প্রকাশিত হলো। আর পাঠকরাও অভাবনীয় সাড়া দিলেন। গবেষণার উপরে লেখা বই আগ্রহভরে মানুষ পড়ছে, এটা বিজ্ঞানী হিসাবে আমার জন্য খুব বড় একটা প্রাণ্ণি।

বইটা লেখার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিলো বটে, তা হলো বাংলাদেশে প্রচুর নতুন গবেষক তৈরী করা। বইটা প্রকাশের পরে বিপুল সংখ্যক আগ্রহী পাঠকের কাছ থেকে বার্তা পেয়েছি। গবেষণার জগতে পা রাখতে তাঁদের বিপুল উৎসাহ। এই ব্যাপারটা খুবই আশাব্যঞ্জক। বইটি প্রকাশের পর

যদি বাংলাদেশে প্রতি বছর ১০০ জন নতুন গবেষকও তৈরী হয়, তাহলে কয়েক বছরেই বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটবে অনেক। আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো কখন সেটা বলি — কয়েকদিন আগে একজন পাঠকের একটি বার্তা পেলাম। তিনি লিখেছেন, গত বইমেলাতে বইটি কেনার পরে গবেষণায় তাঁর আগ্রহ জন্মায়। বইটি থেকে গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবার পর তিনি গবেষণার কাজে হাত দেন। এবং সফলও হন। অল্প কয়েকদিন আগেই তাঁর লেখা প্রথম গবেষণাপত্রটি একটি কনফারেন্সে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমি খুব আশাবাদী, এরকম আরো অনেক গবেষকের গবেষণার ভিত্তিটি গড়ে দেয়ার কাজটা এই বইটা করবে।

দ্বিতীয় সংস্করণে একেবারে আনকোরা কয়েকটি লেখা যোগ করা হয়েছে, এর মাঝে রয়েছে গবেষণার নানা প্রতিবন্ধক কীভাবে এড়াতে হবে, জার্নালে কীভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে হবে, গবেষক হিসাবে পরিচিতি অর্জনের নানা পরামর্শ, পিএইচডি ডিগ্রির দিকনির্দেশনা, এবং খুদে গবেষকদের জন্য কিছু পরামর্শ। আশা করি এই সংস্করণটিও নবীন গবেষকদের গবেষণার কাজে আসবে।

বইটির নানা বিষয়ে বিস্তারিত কথা ও অনলাইনে ডাউনলোড করে নেয়ার মতো নানা ডকুমেন্ট পাওয়া যাবে বইয়ের ওয়েবসাইট www.elochinta.com এবং বইয়ের ফেইসবুক পেইজ www.facebook.com/gobeshona-এ। গবেষণার রাজ্যে সবাইকে স্বাগতম।

ড. রাগিব হাসান
বার্মিংহাম, আলাবামা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু কীভাবে আমরা তা হলাম? মানবসত্ত্বতার ইতিহাসের অগ্রগতির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ— আর তা সম্বন্ধে হয়েছে গবেষণার জন্য। গবেষণার মাধ্যমে অজানাকে জানা, নতুন উত্থান, রোগ-শোক-জরাকে জয় করা হয়েছে সম্ভব।

কিন্তু গবেষণা বলতে আসলে কী বোঝায়? কীভাবে একজন নবীন গবেষক গবেষণার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে পা দেবেন? কীভাবে গুচ্ছিয়ে কাজ করে সমস্যার সমাধান করবেন, কীভাবে গবেষণাপত্র লিখবেন ও কোথায় প্রকাশ করবেন, এমনকি কীভাবে একটা নতুন আইডিয়াকে গুচ্ছিয়ে লিখবেন, চিন্তা ও যাচাই করবেন— এসব নিয়ে নবীন গবেষকেরা অনেক সময়ই সমস্যায় পড়েন।

আমি পেশায় ও নেশায় একজন কম্পিউটারবিজ্ঞানী। গবেষণাই আমার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু গবেষণা কীভাবে করতে হয়, তা আমাকে শিখতে হয়েছে। আমার শিক্ষাগুরুদের হাতে স্নাতক এবং পরে পিএইচডি করার সময়ে অনেক কিছু ধাপে ধাপে হাতেকলমে শিখে, তবেই গবেষণার পদ্ধতি বুঝতে পেরেছি। গবেষণার কৌশল সম্পর্কে জানার পরে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা শেখা খুব কঠিন নয়— কেবল দরকার দিকনির্দেশনার।

বাংলা ভাষায় গবেষণা করার পদ্ধতি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করা হয়নি, এ-সংক্রান্ত সবকিছুই ইংরেজিতে। তাই আমি চেয়েছি, গবেষণা করার নানা ধাপ, নানা দিককে মাতৃভাষা বাংলায় সবার কাছে তুলে ধরতে। অনলাইনে মুক্ত জ্ঞানের সাইট [শিক্ষক.কম](http://www.shikkhok.com) (www.shikkhok.com) প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, বাংলায় কোনো কিছু সবাই যেভাবে বুঝতে

পারেন, অন্য কোনো ভাষায় সেভাবে শেখা সম্ভব নয়। তাই আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস নবীন ও হবু গবেষকদের খুব কাজে আসবে।

বইটা কাদের জন্য?

এই বইটা পড়ে উপকার পেতে হলে আপনাকে গবেষক হতে হবে না; বরং বইটা ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক—সবার কথা মাথায় রেখেই লেখা। আপনার যদি শ্লাতক, মাস্টার্স বা পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা করা বা থিসিস লেখার দরকার হয়, তাহলে এটা পড়ে আপনি গবেষণার সব পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন। এ ছাড়া একাডেমিক লেখালেখি, গবেষণাপত্র প্রকাশ—এসব কাজের জন্য এখানে রয়েছে বিস্তারিত নির্দেশনা। আমি বইটা খুব সহজ ভাষায় লিখেছি, যাতে করে সবাই এটা পড়ে গবেষণার জগতে প্রবেশ করতে পারেন খুব সহজেই।

বইটা যেভাবে পড়বেন

বইটা ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি অংশে। প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণা কাকে বলে, এর প্রয়োজনীয়তা ও মূলনীতি নিয়ে। এর পরে আস্তে আস্তে বলা হয়েছে, কীভাবে গবেষণা শুরু করবেন, বিষয় নির্বাচন ও লিটারেচার রিভিউ করবেন। তার পরে ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে, রিসার্চ পেপার পড়া, বোকা এবং নিজের গবেষণাপত্র কীভাবে লিখবেন। গবেষণার সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন আইডিয়া কীভাবে চিন্তা করবেন ও যাচাই করবেন। এ ছাড়া গবেষণার ফলাফলকে প্রেজেন্টেশন বা বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করার নানা কৌশল সম্পর্কে লিখেছি। এবং সবশেষে আলোচনা করেছি গবেষণার অর্থায়ন কীভাবে করবেন এবং গবেষণার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় যেমন— গবেষকদের অভ্যাস, গবেষণার জন্য সময় জোগাড় করা— এ সবকিছু।

বাংলাদেশে বসেই একসময় প্রখ্যাত সব বিজ্ঞানী বিশ্বমানের গবেষণা করেছেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বোস, কুদরত-ই-খুদা, মাকসুদুল আলম, আবেদ খান— এঁদের মতো বরেণ্য বিজ্ঞানীরা সারা বিশ্বে বাঙালিদের নাম উজ্জ্বল করেছেন। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে রেখেছেন বিশাল অবদান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের নতুন প্রজন্মের তরঙ্গেরা গবেষণার জগতে অনেক বড় কিছু করার ক্ষমতা রাখে। এই উদ্যমী হবু গবেষকদের

পথ দেখানোর জন্য এই বইটা লেখা। আমি নিজে নানাভাবে কষ্ট করে ও ঠেকে গবেষণা সম্পর্কে যা যা শিখেছি, তা-ই তুলে ধরেছি এখানে।

বইটা লেখার সময়ে আমার স্ত্রী ডা. জারিয়া আফরিন চৌধুরী আর আমাদের সন্তান যায়ানের যে সাপোর্ট পেয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি, তার ফলেই শিক্ষকতা ও গবেষণার ব্যস্ততার মাঝেও বইটা লিখতে পেরেছি। আর আমার বাবা মা এবং আমার শিক্ষাগুরু প্রফেসর কায়কোবাদ ও প্রফেসর মেরিঅ্যান উইলেটের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। নবীন গবেষকদের পথ্যাত্রা শুভ হোক।

ড. রাগিব হাসান

কম্পিউটারবিজ্ঞান বিভাগ

ইউনিভার্সিটি অব আলাবামা অ্যাট বার্মিংহাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

<http://www.ragibhasan.com>



গবেষণার জগৎ^১
পর্যায় ও প্রাথমিক প্রস্তুতি

গবেষণার প্রাথমিক ধারণা

গবেষণা কী কেন কীভাবে?

গবেষণা বা research, ছোট একটি শব্দ। কিন্তু মানবসত্ত্বতার ইতিহাসে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন কালের সেই গুহাবাসী মানুষ হতে আজকের এই একবিংশ শতকের প্রযুক্তিনির্ভর জগতে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে একটি কারণেই— তা হলো বহু মানুষের গবেষণা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জেনে বা না জেনেই কিন্তু আমরা অনেকে গবেষণা করে চলেছি। হতে পারে গবেষণাটা যুগান্তকারী কিছু একটা নতুন জিনিস আবিষ্কারের অথবা হতে পারে আলু-পটোলের দামের সঙ্গে হজমি গোলার চাহিদা বাড়া-কমার সম্পর্ক বের করার। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা— এটাই তো গবেষণা।

গবেষণা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই গবেষণা কাকে বলে, তা জেনে নেওয়া যাক।

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)-এর স্বীকৃত সংজ্ঞানুসারে গবেষণা বা রিসার্চ হলো— ‘Creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications’

ওপরের সংজ্ঞাটা খেয়াল করলেই গবেষণা কাকে বলে, তার মৌল্দা কথাটা বেরিয়ে আসবে। গবেষণা হলো নতুন কিছু করা, যা আগে করা হয়নি বা করা হলেও ভালো করে হয়নি। সেটা করতে হবে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে এবং এ থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য।

গবেষণা করতে গেলে কি বিজ্ঞানী হতে হবে? না, মোটেও না; বরং

গবেষণার সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চললে আম-জনতার যে কেউই হতে পারেন গবেষক, করতে পারেন গবেষণা।

গবেষণার রকমফের

গবেষণা নানা রকমের হতে পারে। যেমন— বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা, যেখানে বর্তমানে আছে এমন কোনো কিছুর কোনো বৈশিষ্ট্য, যা নিয়ে কিছু জানা বা যাচাই করা হয়। আবার হতে পারে অনুসন্ধানী গবেষণা, যেখানে অজানা কোনো কিছুর সম্পর্কে ধারণা পেতে গবেষণা করা হয়েছে। কখনো কখনো গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কারণ বের করা, কেন কোনো একটি ঘটনা ঘটছে। কোনো কোনো সময় গবেষণা করা হয় কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সেই ঘটনা-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে। গবেষণার কার্যক্ষেত্রের ভিত্তিতে তা হতে পারে মৌলিক গবেষণা অথবা ফলিত গবেষণা। তবে সব ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রেই একটা কথা প্রযোজ্য, তা হলো গবেষণা কোনো কিছুকে খুব সিস্টেম্যাটিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের উত্তব ঘটানো।

গবেষণা কেন করবেন?

দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে গবেষণা করা লাগে বটে, তবে সেসব অনানুষ্ঠানিক বা ইনফরমাল গবেষণার চেয়ে পড়াশোনা বা বিজ্ঞানের প্রয়োজনে গবেষণা করা হয় বেশি। কেন গবেষণা করবেন, সেই প্রশ্নের জবাবে আসুন, দেখে নিই একটা তালিকা—

- ১) পড়াশোনার অংশ : পিএইচডি, মাস্টার্স, এমনকি স্নাতক পর্যায়ের থিসিস লেখার জন্য গবেষণা করতে হবেই।
- ২) উচ্চশিক্ষা : আবেদন করার সময়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকলে খুব কাজে আসে।
- ৩) পেশাগত কাজের জন্য : শিক্ষক, বিজ্ঞানী, এঁদের তো বটেই— আরও অনেক পেশায় গবেষণা করার দরকার আছে। ধরা যাক, কোনো একটি কারখানার বর্তমানে যেসব বাতি তৈরি হয়, তা এক মাস চলার পরেই নষ্ট হয়ে যায়। একজন গবেষক বাতি ও কারখানার যন্ত্রাংশ নিয়ে গবেষণা করে নতুন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি বাতি বানানোর পদ্ধতি বের করতে পারেন।

৪) জনস্বার্থ : সামাজিক অনেক সমস্যার কারণ বের করার জন্য জনস্বার্থেও গবেষণার প্রয়োজন আছে। যেমন— ধরা যাক বাংলাদেশে আর্সেনিক রোগের প্রাদুর্ভাবের আসল কারণটা কী? অথবা ডায়রিয়ার সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা কী? এসব প্রশ্নের জবাব বের করতে হলে বিজ্ঞানীদের করতে হবে গবেষণা।

গবেষণা করতে শেখা

গবেষণা কি শেখার জিনিস? অবশ্যই। কারণ গবেষণা করাটা খুব পদ্ধতিগত ব্যাপার। এখানে নির্দিষ্ট ধাপ আছে, যেগুলো এড়ানোর কোনো উপায় নাই। তাই আপনি পড়া, পেশা কিংবা জনস্বার্থ— যে কারণেই গবেষণা করত্ব না কেন, আপনাকে গবেষণা করাটা শিখতে হবে ভালো করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণার গুরুত্ব শ্রদ্ধেয় ড. কায়কোবাদ স্যার গবেষণায় উদ্বৃক্ত করতে আমাদের সব সময় বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার কালজয়ী সব গবেষকের কথা শোনাতেন। জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বোস, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সিভি রমন, কুদরত-ই-খুদা— এঁরা এক সময় বিশ্বসেরা গবেষণা করেছেন, নোবেল জয় করার মতো উচ্চমানের গবেষণা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার বিচারে আমাদের দেশে নতুন গবেষণার হার সেরকম আশাব্যঙ্গিক নয়। অথচ গবেষণা শেখাটা জটিল কোনো কাজ না; বরং বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে গবেষণার অনেক ধাপ হয়ে গেছে সহজ।

তাই খুব সহজ এই গবেষণার ধাপগুলোকে শিখে নিতে পারলে সহজেই আপনি গবেষণার রাজ্যে রাখতে পারবেন পা, খুলে দিতে পারবেন জ্ঞানের রাজ্যের নতুন জানালা, উন্মোচন করতে পারবেন নতুন কোনো রহস্যের দ্বার। আর একই সঙ্গে আপনার পড়াশোনা কিংবা পেশাতেও এগিয়ে যেতে পারবেন।

তাই আসুন, গবেষণা করতে শিখি, একেবারে গোড়া থেকেই।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কি দেশে বসে গবেষণা করা সম্ভব? এ ব্যাপারে অনেকের অভিযোগ— গবেষণা করতে গেলে অনেক রিসোর্স লাগে, সেটা দেশে বসে পাওয়াটা কঠিন।

চিন্তার কিছু নাই, অবশ্যই সম্ভব। কীভাবে? চলুন, দেখা যাক।

প্রথম অভিযোগ হলো বাংলাদেশে বসে বিশ্বের কোথায় কী রিসার্চ হচ্ছে, তা জানাটা বেশ কঠিন। নতুন কিছু করতে হলে জানতে হবে (না হলে নতুন করে জুতা আবিষ্কারে পণ্ডশ্রম হতে পারে)। তাই গবেষণার জন্য রিসার্চ পেপার জোগাড় করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুগল স্কলারে (www.scholar.google.com) সার্চ দিলে রিসার্চ পেপারের কপি পিডিএফ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অনেক সরকারি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে রিসার্চ পাবলিকেশনের সাবস্ক্রিপশন আছে। সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া চলে (বুয়েটে আছে জানি, অন্যত্রও থাকার কথা)। আর কিছু না পেলেও অনলাইনে নানা রিসার্চ-সংক্রান্ত গ্রন্থে অনুরোধ করে প্রবাসী কারও মাধ্যমে পেতে পারেন। আর শেষ চেষ্টা? রিসার্চ পেপারে লেখকের ইমেইল দেওয়া থাকে, সেখান থেকে তাকেই ইমেইল করে কপি চাইতে পারেন। অধিকাংশ লেখকই চাইলেই কপি পাঠান।

কম্পুমিস্টির হিসেবে আমার জ্ঞানের সীমা যন্ত্রগণক-টাইপের বিষয় পর্যন্তই, তবে ইদানীং অধিকাংশ বিষয়ে কম্পিউটেশনাল অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। আপনি যদি সেরকম কোনো বিষয়ে কাজ করেন, তাহলে মোটামুটি মানের কম্পিউটার যা পাওয়া যায়, তা দিয়েই কাজ চলবে। দরকার হলে কয়েকটি কম্পিউটার এক করে ক্লাস্টার বানিয়ে কাজ করা চলে। তবে আরও ভালো হলো নানা কোম্পানির ফ্রি কম্পিউটার টাইমের সুযোগ নেওয়া। যেমন— এমাজনের ক্লাউডে ছাত্রদের জন্য প্রতি মাসে ফ্রি ১০০

ডলার ইউজ করার ব্যবস্থা আছে। (তবে সমস্যা একটাই, ক্রেডিট কার্ড নম্বর দেওয়া লাগে, তবে বাংলাদেশে অনেকে এই নম্বর ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারে, খোঁজ নিন)। এটা বেশ ভালো একটা সুযোগ (এবং মাসে ১০০ ডলারের ক্লাউড টাইম খরচ করা রীতিমতো জটিল কাজ)।

রিসার্চের গোঁড়ার কথাটা তো বলেই ফেললাম, ইন্টারেষ্টিং বিষয় পাওয়াটা হলো আরও জটিল কাজ। দুনিয়ায় অনেক কিছুই আছে, সেটার মধ্যে কোনটাতে আপনার আগ্রহ আছে এবং অন্যদেরও আগ্রহ থাকবে, সেটা বের করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সাজেশন যেটা দিতে চাই তা হলো, মোবাইল ডিভাইস নিয়ে কাজ করেন। আপনি যে বিষয়েই পড়াশোনা করেন না কেন, মোবাইল ডিভাইসের সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র বেরোবেই। স্মার্টফোন আজকাল বাংলাদেশে এত সন্তা যে, প্রায় অনেকেরই নাগালের মধ্যে। আর স্মার্টফোনের সেলর বা লোকেশন ক্যাপাবিলিটি ব্যবহার করে ইন্টারেষ্টিং সব কাজ করা সম্ভব। যেমন— স্মার্টফোনভিত্তিক ট্রাফিক জ্যাম প্রেডিক্টর কিংবা স্মার্টফোনভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা অথবা স্মার্টফোন ব্যবহার করে আপনার টপিক রিলেটেড কিছু। এতে করে সুবিধাটা হলো, আপনার কাজে রিসোর্স সহজেই পাবেন। আর বাংলাদেশে প্র্যাকটিকাল ফিল্ডে কাজে লাগে এমন কিছু একটা বের হবে (এ ধরনের কাজে বিদেশি ফান্ডিংও অনেক)।

সব শেষে ফান্ডিং নিয়ে ছোট একটা কথা বলি। রিসার্চের ফান্ড দেশে বসেই কিন্তু পেতে পারেন। দুনিয়ার নানা সংস্থা বা কোম্পানি ফান্ড নিয়ে বসে আছে। ইন্টারেষ্টিং প্রজেক্টে সহজেই পেতে পারেন। গুগলের রাইজ ছাড়াও ফ্যাকাল্টি এওয়ার্ড, সায়েন্স ফেয়ার আছে, অন্য অনেক সংস্থার এরকম গ্রান্ট আছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, একটু সময় দিলেই সেটা পাবেন। আপনার রিসার্চ আইডিয়াটাকে ভালো করে প্রেজেন্ট করাই হবে মূল চ্যালেঞ্জ।

আর এই বইটাতে আমরা সেই জিনিসটাই শিখব। কীভাবে আদি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সহজে আমরা করতে পারি গবেষণা।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো বিজ্ঞানের ও গবেষণার একেবারে মূল ভিত্তি। চারদিকের পৃথিবী সম্পর্কে কীভাবে আমরা জানতে পারব, কীভাবে নতুন কিছু বের করব, এর সবটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে বের করা হয়। তাই শুরুতেই চলুন, জেনে নিই এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সূচনা বহুদিন ধরে মিসরীয়, গ্রিক, আরব, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাতে হলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক বলা হয় যাকে, তিনি হলেন ইংরেজ দার্শনিক রজার বেকন। এর পরে অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির। নানা পরিবর্তন শেষে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো যা হয়েছে, তা হলো অনেকটা এরকম—

প্রথম ধাপ : প্রশ্ন উত্থাপন করা।

দ্বিতীয় ধাপ : পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য জোগাড় করা।

তৃতীয় ধাপ : প্রশ্নের জবাব দিতে পারে— এমন একটি অনুকল্প বা হাইপোথিসিস তৈরি করা।

চতুর্থ ধাপ : এই হাইপোথিসিস বা অনুকল্পটি সঠিক কি না, তা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপাত্ত সংগ্রহ করা।

পঞ্চম ধাপ : উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণ করা।

ষষ্ঠ ধাপ : উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার মর্মার্থ বের করা এবং সেটাতে প্রাথমিক অনুকল্পটি প্রমাণিত হয় কি না, তা দেখা। অনুকল্পের সঙ্গে উপাত্ত না মিললে অনুকল্পটি পরিবর্তন করে নতুন অনুকল্প গঠন এবং চতুর্থ ধাপে আবার ফিরে যাওয়া।

সপ্তম ধাপ : গবেষণার ফলাফল যাচাই করা।

অষ্টম ধাপ : গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা।

গবেষণার জগতে আপনার প্রবেশের প্রথম পর্যায়ে তাই মাথার মধ্যে
একেবারে ঢুকিয়ে নিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো।

গবেষণা বা রিসার্চ যেভাবে করবেন

শুরুটা করবেন কীভাবে? আসুন, চটজলদি গবেষণার সব পর্যায় নিয়ে জেনে ফেলি সংক্ষেপে।

রিসার্চ বা গবেষণা মানে কী? কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটা নতুন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো কিংবা কোনো কিছুর কার্যকারিতা বের করাটাই কিন্তু রিসার্চের মধ্যে পড়ে। সেটা যেকোনো বিষয়ের ওপরেই হতে হবে।

আর্দৰ রিসার্চ অনেকটা এরকম— প্রথমে কোনো বিষয়ে একটা তত্ত্ব বা হাইপোথিসিস দাঁড় করাতে হবে। তারপর সেটা যাচাই করার জন্য একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সেই পরীক্ষার সব তথ্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে সেই তত্ত্বটি সঠিক কি না, তা নির্ধারণ করা। এবং সবশেষে সেই তত্ত্বকে গ্রহণ বা বর্জন করা।

থিওরিটা না হয় বোবা গেল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রিসার্চ করবেন কীভাবে? রিসার্চের ক্ষেত্রে প্রথম কথা শেষ কথা হলো, পড় পড় পড়!! কোনো কিছু সম্পর্কে রিসার্চের শুরুটা করতে হবে সেই বিষয়ে পড়াশোনা করে। গুগল স্কলারে সেই বিষয় সম্পর্কে সার্চ করলে ওই বিষয়ের ওপরে সব গবেষণা নিবন্ধের তালিকা অনায়াসে পাওয়া যায়। অনেক জার্নালে সাবস্ক্রিপশন চাইলেও বাংলাদেশের অনেক ইউনিভার্সিটিতে সেটার ব্যবস্থা আছে। না হলে নানা ফেসবুক গ্রুপে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করে যেকোনো পেপারের কপি পাওয়া সম্ভব। এভাবে যেকোনো বিষয়ের ওপরে অন্য সবার কী কী কাজ হয়েছে তা জেনে নিতে হবে। প্রতিটি পেপার পড়ার সময় ওই পেপারের ওপরে এক পাতার রিপোর্ট রাখতে হবে লিখে। তাতে থাকবে (পেপারের সারাংশ, ভালো দিক, দুর্বল দিক এবং মন্তব্য)। আরও ভালো হয় সব পেপার পড়া হয়ে গেলে সেগুলোর ভিত্তিতে একটা সার্ভে লিখে ফেলা নিজেই। এই সার্ভে যেমন প্রকাশ করা সম্ভব,

তেমনি নিজের রিসার্চের পরের অংশেও সেটা লাগবে কাজে অনেক।

পরের ধাপে আসবে এই রিসার্চ সার্ভের ভিত্তিতে দেখা যে, কোন বিষয়ে এখনো কাজের সুযোগ আছে, মানে কেউ কাজ করেনি। সেটা বের করতে পারলে সেই বিষয়ে কাজ শুরু করা যেতে পারে। তবে চোখ-কান বন্ধ করে কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে শুরুতেই ভেবে নিতে হবে কয়েকটা দিক। রিসার্চের প্রশ্নটা কী, কোন বিষয়ের ওপর কাজ করছেন, সেটাকে তিন-চার বাকে প্রকাশ যদি করতে না পারেন, তাহলে বুঝতে হবে রিসার্চের মূল গন্তব্য সম্পর্কে আপনার ধারণাটা এখনো নয় পরিষ্কার। সেটা গুছিয়ে নিন। তার পর ভাবুন আপনার এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে কীভাবে এক্সপেরিমেন্ট বা থিওরির কাজ করতে হবে, আপনার কাজ যে সঠিক, সেটা কীভাবে যাচাই বা প্রমাণ করবেন এবং সবশেষে আপনার কাজের সঙ্গে অন্যদের কাজের কী পার্থক্য হবে, কোন দিক দিয়ে আপনার কাজটা হবে নতুন কাজ।

সমস্যার সমাধানের জন্য আইডিয়া বের করতে হবে, সেগুলোর ভালো-মন্দ যাচাই করে বের করতে হবে সর্বোত্তম আইডিয়াটিকে। এরপর সমস্যা সমাধান হচ্ছে কি না, যাচাই করে নিতে হবে পরীক্ষার মাধ্যমে। আর পরীক্ষালক্ষ উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হবে। সবশেষে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করতে হবে গবেষণাপত্র ও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে।

গবেষণার কর্মপত্র বা ওয়ার্কফ্লো (workflow)

মোটের ওপর গবেষণার মূল ধাপগুলো হচ্ছে এরকম—

প্রথম ধাপ : গবেষণার এলাকা নির্বাচন

দ্বিতীয় ধাপ : লিটারেচার রিভিউ

তৃতীয় ধাপ : গবেষণার সমস্যা নির্বাচন এবং সমাধানের পরিকল্পনা করা

চতুর্থ ধাপ : সমস্যা সমাধান

পঞ্চম ধাপ : পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন

ষষ্ঠ ধাপ : ফলাফল উপস্থাপন (পেপার, প্রেজেন্টেশন)

গবেষণার কাজ শুরু করতে গিয়ে ভূমিকায় সময় নষ্ট না করে নেমে পড়ুন। এই ইন্টারনেটের যুগে ঘরে বসেই করা সম্ভব বিশ্বমানের সব কাজ। এগিয়ে চলুন, দেখুন স্বপ্ন। আর করুন নতুন অসাধারণ সব গবেষণা।

গবেষণা শুরুর আগে যা শিখে নেবেন

গবেষণার কাজটা শুরু করার আগে কিছু জিনিস শিখে নেওয়া ভালো। এর মধ্যে আছে নানা রকমের সফটওয়্যার বা এপ্লিকেশন, সাইটেশন করার কায়দা, এবং কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস।

নোটবুকের ব্যবহার

না, ইলেকট্রনিক নোটবুক বা অনলাইনের কোনো টুল নয়; বরং বলছি একেবারে আধিকালের বাঁধানো খাতার কথা।

রিসার্চ শুরুর প্রথম কাজ হলো নোটবুক ব্যবহার করা। আমার ছাত্রদের প্রথম যেটা শিখাই তা হলো, ছেঁড়া বা লুজ শিটে কখনোই কিছু না লিখতে। কারণ সেটা হারাবে নিশ্চিত। কাজেই একটা ভালো বাঁধানো এবং কয়েক শ পাতার খাতা কিনে নিন। প্রতিদিন নতুন একটা পাতায় তারিখ লিখে কাজ শুরু করবেন। রিসার্চের আইডিয়া, কী করছেন, কী করতে চান, এগুলো সব সেখানে লিখে রাখবেন।

কখনো যদি মিটিং করেন সুপারভাইজার অথবা সহযোগী গবেষকদের সঙ্গে, অবশ্যই সিন্ধুলিত এবং কী করা দরকার, তা লিখে রাখবেন সঙ্গে সঙ্গেই। খেয়াল রাখবেন, মানুষের মনে সাতটার বেশি জিনিস থাকে না। আর সব মনে থাকবে বলে ভাবলেও আসলে পাঁচ মিনিটের মাথায় অধিকাংশ জিনিস মাথা থেকে হারিয়ে যায়।

অনেক বিষয়ে ল্যাব নোটবুক একেবারেই বাধ্যতামূলক। যেমন—
বায়োলজি, যেকোনো এক্সপেরিমেন্টাল সাবজেক্ট, এরকম।

লেখার সফটওয়্যার

রিসার্চ পেপার লেখার জন্য এক কথায় সেরা সফটওয়্যার সিস্টেম হলো—
LaTeX, এটা শিখে নিন। প্রথমে একটু কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু ল্যাটেক্সে

করা পেপারের চেহারা দেখলে বুঝবেন কেন এটাকে ব্যবহার করতে বলছি, ছাপার মান থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নিখুঁতভাবে সেখানে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ল্যাটেক্স শিখতে যদি না পারেন আলসেমির জন্য, সে ক্ষেত্রে ওয়ার্ড বা এরকম অন্যান্য ওয়ার্ডপ্রসেসরে কীভাবে ফুটনোট, সাইটেশন, এসব দিতে হয়, তা শিখে নিন। অনলাইনে বিস্তর টিউটোরিয়াল আছে।

ছবি যোগের জন্য ছবি এডিট, ডেটা থেকে গ্রাফ তৈরির নানা কৌশল—এসব শিখতে হবে। গ্রাফ তৈরির জন্য এক্সেল মোটামুটি চলে, তবে ভালো গ্রাফ পেতে হলে আপনাকে R অথবা SAS/SPSS/JMP এসব ব্যবহার শিখতে হবে।

ফলাফল বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যান

কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ বাদে অধিকাংশ গবেষণার জন্যই আপনাকে ডেটা বা উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংগৃহীত উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হয়, যেমন আপনার তত্ত্বের সঙ্গে উপাত্ত মেলে কি না বা উপাত্ত থেকে নতুন কী তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। এ কাজটা করতে হলে আপনাকে শিখে নিতে হবে নানা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যারের ব্যবহার।

খুব সহজ একটা সফটওয়্যার হলো মাইক্রোসফট এক্সেল। এটা দিয়ে সহজ ধরনের কাজগুলো করতে পারবেন। কিন্তু ডেটা প্রচুর হলে এবং তা নিয়ে জটিল মডেলিং করতে হলে আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার প্যাকেজ ব্যবহার করতে হবে। সে জন্য SAS, SPSS, JMP, R, MATLAB এসব সফটওয়ার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং তা দিয়ে কীভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ, মডেলিং, কো-রিলেশন অ্যানালাইসিস এসব করতে হয়, তা শিখে নিন। আপনাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে না, তবে কাজ চালানোর মতো জানতে হবে।

লিটারেচার সার্চ

নাহ, এটা সাহিত্য না; বরং আপনার বিষয়ে নানা কাজ যা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, সেটার কথা বলছি। যেকোনো রিসার্চের শুরুর কাজ এটাই। নানা অনলাইন রিসার্চ ইনডেক্স বা সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার শিখে নিন। যেমন—

Google scholar, Pubmed, scopus এসব। কীভাবে গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত পেপার খুঁজে পাবেন, সেগুলোর তালিকা বানাবেন, তা শিখতে হবে। LaTeX এর সঙ্গে আসা BibTeX এ ক্ষেত্রে সেরা। তবে সেটা না পারলে অন্তত EndNote বা এ-জাতীয় জিনিস শিখে নিন। আর রিসার্চ সাইটেশন গুচ্ছিয়ে রাখার জন্য Zotero বা এরকম সাইটেশন ম্যানেজার ব্যবহার করতে পারেন। নানা জার্নালে বা কনফারেন্সে নানা রকমের সাইটেশন স্টাইল ব্যবহার করা হয়। BibTeX জানা থাকলে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, তবে সেটা ব্যবহার না করলে নানা রকমের সাইটেশন স্টাইল সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

ব্যাকআপ ও ভার্শন কন্ট্রোল

রিসার্চের পেপার যেখানে লিখবেন, সেটাকে ভার্শন কন্ট্রোলের অধীনে আনুন। ড্রপ বক্সে রাখলে এমনিতেই এটা হয়, তবে git, subversion এগুলো শিখে নিতে পারলে অনেক বেশি কাজে আসবে। এটা আবশ্যিক। কারণ আপনার কম্পিউটার ক্রাশ করলে আপনার রিসার্চ যদি হারিয়েও যায়, অনলাইনে এভাবে ব্যাকআপ করা থাকলে সব ভার্শনের, আপনি সহজেই ফেরত যেতে পারবেন। তা ছাড়া একাধিক জনে একসঙ্গে কাজ করলে এগুলো ব্যবহার করা নিতান্তই অপরিহার্য।

শুরুর কাজ এটাই, এর সঙ্গে থাকবে অভিধান, বানান নিরীক্ষক। এগুলো ব্যবহার করতে জানা।



গবেষণার বিষয় নির্বাচন ও পরিকল্পনা

গবেষণার বিষয় নির্বাচন

গবেষণার কাজ শুরুর সবার আগের ধাপ হলো গবেষণার জন্য জুতসহ একটা বিষয় খুঁজে বের করা। এটা বড় একটা ধাপ। আসলে এটা গবেষণার আসল কাজের সমান কঠিন একটা ব্যাপার। কারণ কী? কারণ হলো সঠিক প্রশ্ন বা সমস্যা খুঁজে বের করাটাই গবেষণার সাফল্যের অর্ধেক অংশ।

হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, তেমনি সব রিসার্চ প্রবলেমও এক রকমের না। কোনটা সহজ সমস্যা— সমাধান করা সহজ, কিন্তু তা করে কৃতিত্ব তেমন কিছু পাবেন না। দুধ-ভাতটাইপের কাজ আর কি। সেরকম সমস্যা বেছে নিলে আপনার কাজ হবে সহজ, কিন্তু লাভ কম। পক্ষান্তরে যদি খুব দুর্জন সমস্যা বেছে নেন, তাহলে সমাধান করতে ঘাম ছুটে যাবে, কিন্তু একবার সমাধান করতে পারলে সেটা বিশাল ব্যাপার।

আবার অন্যদিকও আছে— দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার চিন্তা করলে এমন জিনিস নিয়ে কাজ করা উচিত, যার বাস্তব গুরুত্ব অনেক বেশি। খুব এবস্থান্ত টাইপের অথবা খুব অল্প মানুষ যা নিয়ে মাথা ঘামায়, এমন জিনিস নিয়ে কাজ করতে পারেন বটে। কিন্তু তাতে আপনার নিজের ক্যারিয়ারে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম। যেমন— ধরা যাক (তর্কের খাতিরে) ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের রং কালো কেন এবং গায়ে বোটকা গন্ধ কেন, তা নিয়ে গবেষণা করছেন। এটা হয়তো ইন্টারেস্টিং একটা কিছু হতে পারে, পেপার পাবলিশ হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত বাস্তব জীবনের কোনো বড় সমস্যা সমাধানে আপনার এই কাজটার ভূমিকা থাকবে অনেক, ততক্ষণ এই গবেষণার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কমই হবে।

আরেকটি বিষয় হলো ফান্ডিং এবং বাস্তব প্রয়োগ। আপনি যা নিয়ে কাজ করছেন, সে বিষয়ে ফান্ডিং এজেন্সিদের আগ্রহ কেমন? এবং আপনার বিষয়ে অন্য গবেষকেরাও কি কাজ করছেন? উদাহরণ দিই, ২০০১-০২ সালের

দিকে সেন্সর নেটওয়ার্ক ও পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক ছিল হট টপিক, কম্পিউটার সায়েন্সে। সবাই ওই বিষয়ে কাজ করেছে। কিন্তু এখন আর কেউ এগুলো নিয়ে কাজ করে না। ফলে আপনার যদি লক্ষ্য হয় গবেষণা করে কাজটা পাবলিশ করা এবং তা দিয়ে অ্যাডমিশন বা চাকরির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো, তবে এ বিষয়গুলোতে কাজ করে খুব একটা লাভ হবে না।

গবেষণার সঠিক বিষয় ও সমস্যা নির্ধারণ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হট করে টপিক ঠিক না করে তাই আগে ভেবেচিন্তে কাজ করেন, ভেবেচিন্তে বিষয় বেছে নিন।

কীভাবে সমস্যা বেছে নেবেন? কয়েকটা প্রশ্নের জবাব বের করেন—

- (১) এটা কি গুরুত্বপূর্ণ?
- (২) এটার কি বাস্তব প্রয়োগ আছে?
- (৩) এটা কি খুব সহজ?
- (৪) এটা কি খুব কঠিন?
- (৫) এটা কি ইতিমধ্যেই কেউ সমাধান করে ফেলেছে?
- (৬) এটার ব্যাপারে অন্যদের আগ্রহ কেমন?
- (৭) এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় রিসোর্স বা সাহায্য আপনার হাতের নাগালে আছে কি?

আর একটা কথা মনে রাখবেন, যেটা আমার শ্রদ্ধেয় পিএইচডি অ্যাডভাইজর প্রফেসর মেরিঅ্যান উইঙ্গলেট উঠতে-বসতে বলতেন, “Don’t work on Solutions in search of a problem”, মানে বাস্তব জীবনে সমস্যা না থাকলে কান্সনিক সমস্যা বানিয়ে তার সমাধানের ওপরে কাজ করাটা চরম বোকামি।

গবেষণার পরিকল্পনা

কীভাবে লিখবেন বা যাচাই করবেন?

গবেষণা করতে হলে শুরুতে একটা পরিকল্পনা বা research proposal লেখার দরকার হয়। হতে পারে, আপনার শিক্ষক বা সুপারভাইজারের কাছে একটা প্রজেক্ট শুরু করার প্রস্তাব দিচ্ছেন। অথবা ফান্ডিং বা বৃত্তি পাওয়ার জন্য কোথাও একটা প্রস্তাব রাখতে চান। কেবল গবেষণা নয়—জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে নতুন কোনো কাজে বা প্রকল্প শুরুর আগে করে নিতে হয় মৌক্ষম ও বিস্তারিত পরিকল্পনা। এ অধ্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে ভালো পরিকল্পনা লেখা যায়।

গবেষণা প্রস্তাবে যা থাকে তা হলো একটা সমস্যার সমাধান নিয়ে আপনি কীভাবে কাজ করতে চান, তার একটা খসড়া পরিকল্পনা। এটা লেখাটার জন্য কিছু বিষয়ে দক্ষতা লাগে। প্রস্তাবনার একটা বড় উদ্দেশ্য হলো যাঁর কাছে জমা দিচ্ছেন (প্রফেসর, সুপারভাইজার, ফান্ডিং এজেন্সি), তাদের কনভিন্স করা যে,

- আপনি যা করতে চান, সে বিষয়ে আপনার ভালো ধারণা আছে।
- আপনি সবকিছু বা সব দিক ভেবে রেখেছেন।
- আপনি যা করতে চান, সেটা নতুন এবং ভালো কিছু হবে।
- আপনি কীভাবে কী করবেন, সবই আন্দাজ করে রেখেছেন।
- এবং আপনি এ কাজটা করতে পারবেন।

প্রপোজাল লেখার সময়ে কয়েকটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। কী করতে চান, একেবারে তালিকা করে তার সম্পর্কে আপনার নিজেরই পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। কিছু কাজ করে রেখে দেখাতে হবে যে আপনি

আসলেই এসব পারবেন। প্রাথমিক ফলাফল, সেটা প্রপোজালে থাকতে হবে। অন্যদের কাজের সঙ্গে আপনার কাজের কী পার্থক্য, কী ফায়দা হবে, তা লিখতে হবে। এবং সর্বোপরি কাজটা কত দিনে কীভাবে করবেন তা পরিকল্পনা করে রাখবেন।

আবশ্যিকীয় প্রশ্ন তালিকা

একটা রিসার্চ প্রপোজাল ভালো হয়েছে কি না, তা বোঝার উপায় কী? এ ব্যাপারে খুব কাজের একটা তালিকা হলো জর্জ হাইলমাইয়ারের বিখ্যাত একটি প্রশ্ন তালিকা। প্রশ্নের তালিকাটা নিচে দিলাম। গবেষণা প্রস্তাব লেখার সময়ে এই সবগুলো দিক ঠিকমতো লিখেছেন কি না, অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, তাহলেই লিখতে পারবেন দারুণ একটা রিসার্চ প্রপোজাল।

- আপনি কী কাজ করতে চাচ্ছেন? পরিষ্কার করে সোজাসুজি সেটা লেখেন।
- বর্তমানে একই কাজ কীভাবে করা হয় এবং তার সমস্যা কী?
- আপনার প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কীভাবে কাজটা করা হবে এবং কেন আপনি সফল হবেন?
- কাজটা করতে পারলে কী লাভ হবে? কে উপকৃত হবে?
- কাজটা করার বুঁকি কী? সুবিধা কী?
- খরচ কেমন পড়বে? কত দিন লাগবে?
- এবং কীভাবে বুঝবেন যে কাজটা ঠিকমতো আগাছে বা সফলভাবে শেষ হয়েছে?

তাহলে একটা ভালো রিসার্চ প্রপোজাল কীভাবে লেখা শুরু করবেন? ওপরের প্রশ্নগুলোর জবাব গুচ্ছিয়ে লিখে ফেলেন। নবীন গবেষকদের সুবিধার্থে একটা গবেষণা প্রস্তাবের খসড়া নিচে দিলাম। এসব অনুচ্ছেদ দিয়ে শুরু করে দিন। আর প্রতিটি অনুচ্ছেদে বিষয়গুলো গুচ্ছিয়ে লিখে ফেলেন। লেখার পরে একবার কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিন। আর তাকে জিজ্ঞেস করে নিন হাইলমাইয়ারের প্রশ্নগুলোর জবাব আপনার প্রস্তাবনায় ঠিকঠাকভাবে আছে কি না।

গবেষণা প্রস্তাবের অপরিহার্য অংশ

- **সারাংশ (Summary)** : পুরো প্রস্তাবের সারাংশ সংক্ষেপে ১ পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।
- **ভূমিকা (Introduction)** : প্রস্তাবের ভূমিকাংশে এক থেকে দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিবেন প্রস্তাবের মোদা কথা, প্রাথমিক আলোচনা।
- **প্রগোদ্ধনা (Motivation)** : কেন এটা করা দরকার, তা এখানে লিখিবেন।
- **প্রাসঙ্গিক কাজ (Related Work)**: এ বিষয়ে কী কাজ হয়েছে ও তাতে সমস্যা কী, তা এখানে থাকবে।
- **অভিমুখ (Approach)** : আপনি কীভাবে কাজ করবেন?
- **সুবিধা (Benefits)** : আপনার পদ্ধতিতে কাজ করে কী সুবিধা হবে?
- **সময়সূচী (Timeline)** : কবে, কত দিনে এবং কীভাবে কাজটা করবেন, তার খুঁটিনাটি পরিকল্পনা
- **বাজেট (Budget)** : কাজটা করতে টাকা বা রিসোর্স কতটুকু লাগবে
- **মূল্যায়ন পরিকল্পনা (Evaluation Plan)** : কাজটা ঠিকমতো হয়েছে কি না, তা কীভাবে বুঝবেন, তার কথা থাকবে এখানে।



লিটারেচার রিভিউ
গবেষণাপত্র পড়া বোঝা ও সমালোচনা

যেভাবে গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার পড়বেন

শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জীবনের একটি নিত্যদিনের ব্যাপার হলো রিসার্চ পেপার পড়া। জার্নাল বা কনফারেন্সে প্রকাশিত ১০-২০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণাপত্র পড়ে তাতে প্রকাশ করা গবেষণার ব্যাপারে জানা যায়। কোনো বিষয়ে ভালো করে জানতে গেলে আসলে সেই বিষয়ের ওপরে শ খানেক রিসার্চ পেপার পড়া লাগে।

প্রশ্ন হলো, এই রিসার্চ পেপার পড়বেন কী করে? সবার হাতে তো অচেল সময় নাই। আর যদি মাত্র এক-দুদিনেই পড়তে হয় গোটা পাঁচেক পেপার, তাহলে কীভাবে দ্রুত পড়বেন সেটা? এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এটাই। রিসার্চ পেপার দ্রুত পড়ার কিছু টেকনিক বা কায়দা আছে। শুরুতেই বুঝতে হবে, রিসার্চ পেপার কিন্তু গল্ল-উপন্যাস না যে আপনাকে সেটা শুরু থেকে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে; বরং একটি রিসার্চ পেপার পড়ে তা বুঝতে হলে কয়েকবারে অল্প করে করে সেটা পড়তে হবে। আমি আমার ছাত্রদের শুরুতেই এ কায়দাটা শিখিয়ে দিই। ধাপগুলো হলো এরকম—

প্রথম ধাপ : পেপারের শিরোনাম, লেখকদের নাম ও পরিচয় পড়ে ফেলেন। পড়তে ১৫ সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা না। শিরোনাম থেকে কিছুটা ধারণা পাবেন পেপারটি কী নিয়ে, সে ব্যাপারে।

দ্বিতীয় ধাপ : এবারের পেপারের সারাংশ বা abstract পড়ে ফেলুন। সাধারণত এ অংশটি আকারে এক প্যারাগ্রাফ (পাঁচ-ছয় বাক্য) হয়ে থাকে। দরকার হলে এটা দুইবারে পড়ুন। দুই দুগুণে চার মিনিট লাগবে বড়জোর। এটা পড়লে পেপারে কোন সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং কী নতুন কাজ করা হয়েছে বা ফলাফল বা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট এসেছে, তার ওপর ধারণা পাবেন।

তৃতীয় ধাপ : এবারে চট করে পেপারের ভূমিকা (Introduction) ও উপসংহার (Conclusion) পড়ে ফেলেন। ভূমিকাতে মূল ব্যাপারগুলো,

সমস্যাটা কী রকম এবং এই গবেষকেরা কী নিয়ে কাজ করেছেন, কীভাবে, তার ওপর আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য থাকবে। আর উপসংহারে থাকবে লেখকেরা কী কাজ করেছেন, তার কথা। দুটোই পড়ে ফেলে মূল ব্যাপারগুলো নেট করে রাখুন। সময় লাগবে ২০ মিনিট— আধা ঘণ্টার মতো।

চতুর্থ ধাপ : এই ধাপে আপনার কাজ হবে পেপারের ভেতরে মন দিয়ে পড়া। ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশন থাকলে সেখান দিয়ে শুরু করতে পারেন। রিলেটেড ওয়ার্ক বা রিসার্চ থাকলে সেটাও পড়ে নিতে পারেন। তার পরে পড়বেন পেপারের সিস্টেম বা থিওরেটিক্যাল মডেল অথবা আর্কিটেকচার অংশ এবং সবার শেষে খুব মনোযোগ দিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস অংশ। এই ধাপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপে পেপারের মূল ক্লেইম বা দাবি সম্পর্কে যা পড়েছেন, এখানে সেগুলো যাচাই করতে পারবেন। পেপারে যা লেখা হয়েছে শুরুতে, তা মোটেও বিশ্বাস করেন না— এরকম মানসিকতা নিয়ে পড়বেন। লেখকদের কাজই হচ্ছে থিওরেটিক্যাল প্রফ বা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট দিয়ে তাদের দাবিগুলো প্রমাণ করা, কাজেই সেটা তারা করতে পেরেছে কি না, তা যাচাই করে দেখুন। এই কাজটা করতে সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা।

এ চারটি ধাপে আন্তে আন্তে পড়ে ফেলতে পারেন যেকোনো পেপার। কিন্তু পেপার পড়াই কি যথেষ্ট? মোটেও না; বরং পেপার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তার একটা রিভিউ লিখে ফেলতে হবে। আমি আমার ছাত্রদের যে ফরম্যাটে রিভিউ লেখা শিখাই তা হলো এরকম— এক পৃষ্ঠার রিভিউ :

- (১) এক প্যারাগ্রাফে ছয়-সাত বাক্যে পেপারের সারাংশ বা summary
- (২) পেপারের তিন বা ততোধিক শক্তিশালী দিক বা strong point
- (৩) পেপারের তিন বা ততোধিক দুর্বল দিক। এবং
- (৪) পেপার সম্পর্কে আপনার তিন বা ততোধিক মন্তব্য, এখানে আলোচনা করতে পারেন অন্য কীভাবে কাজটা করা যেত বলে আপনার মনে হয়। এই রিভিউ লিখে কিন্তু ফেলে দেবেন না; বরং গুগল ডক বা অন্যত্র সেভ করে রাখবেন। মাস দুই বা বছর খানেক পরে যদি পেপারটাতে কী আছে তা হঠাৎ মনে করার দরকার হয়, তাহলে পুরা পেপারটা আর পড়া লাগবে না, আপনার ওই রিভিউটা পড়লেই চলবে। ওপরের এই ধাপগুলো অনুসরণ করে পেপার পড়ুন, খুব সময় লাগবে না। আর কাজটাকে এত কঠিনও মনে হবে না। ভালো গবেষক হতে হলে নিয়মিত এভাবে রিসার্চ পেপার পড়ার অভ্যাস করুন। যত পড়বেন, তত শিখবেন। আর হবেন ভালো গবেষক।

রিসার্চ পেপার রিভিউ করবেন যেভাবে

গবেষণার অপরিহার্য অংশ হলো অন্যদের গবেষণাপত্র পড়ে, তা থেকে তাদের গবেষণা সম্পর্কে জানা এবং পরবর্তী সময়ে সেটা নিজের গবেষণায় মোক্ষমভাবে কাজে লাগানো। সে জন্য একটা পেপার রিভিউ কীভাবে করতে হয়, তা জেনে নেওয়া দরকার।

আমার ক্লাসের ছাত্রদের বা আমার গ্রুপের ছাত্রদের প্রায়ই গবেষণাপত্র পড়তে দিই কাজ হিসেবে। আবার কনফারেন্স বা জার্নালের রেফারি হিসেবে আমাকেও রিসার্চ পেপার পড়ে যাচাই করতে হয়। চলুন, জেনে নিই, কীভাবে একটা রিসার্চ পেপার বা গবেষণাপত্র রিভিউ করবেন।

গবেষণাপত্র যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হলো তাতে যা দাবি করা হয়েছে, তা ধোপে টেকে নাকি, তা দেখা। কনফারেন্স বা জার্নালে পিয়ার রিভিউ (peer review) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, মানে এক গবেষকের লেখা অন্য গবেষক বা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ যদি সম্মতি দেন, তবেই সে লেখা হয় প্রকাশিত।

একটা রিসার্চ পেপার রিভিউ বা যাচাই করতে গেলে শুরুতেই পেপারের শুরুর অংশ, অর্থাৎ abstract পড়ে ধারণা করে নিন, এটা কিসের ওপরে লেখা। Introduction অংশ থেকে দেখে নিন, লেখকেরা কী সমস্যার সমাধানে পেপারটা লিখছেন। আর কী কী অবদান আছে বলে দাবি করছেন শুরুতে।

এর পরের কাজ হলো পেপারের বাকি অংশগুলো দেখা। পেপারে কোনো হাইপোথিসিস বা তত্ত্ব দেওয়া হলে সেটা পেপারের শুরুতেই থাকবে, তা লিখে ফেলুন নোটবুকে। অথবা লেখকদের দাবি (যেমন- ‘আমাদের সিস্টেম ১০ শতাংশ দ্রুত কাজ করে’ ইত্যাদি ইত্যাদি)। পেপারের ভেতরের অংশে দেখুন এসব দাবির সমক্ষে প্রমাণ দেওয়া আছে কি না।

এক্সপেরিমেন্ট করা হলে এর সবকিছু ঠিক আছে কি? স্যাম্পল সাইজ যথেষ্ট বড়? এজাম্পশন বা পূর্বধারণাগুলো ঠিক আছে? যেসব অনুমিতির ভিত্তিতে কাজ করা হচ্ছে, সেগুলো ঠিক?

আরও দেখতে হবে, পেপারের বিষয়ের ওপর লেখকের ধারণা কী রকম। তা বোঝা যাবে অন্যান্য বিজ্ঞানীর গবেষণার কথা লেখকেরা উল্লেখ করেছেন কি না এবং অন্যদের কাজের সঙ্গে তাঁদের কাজের পার্থক্য তুলে ধরেছেন কি না। নতুন করে চাকা আবিষ্কার যেমন অভিনব না, তবে এমন চাকা যা নিজের ভারসাম্য নিজেই বজায় রাখে, তা অভিনব হতে পারে— পেপারে দেখতে হবে নিজের কাজের ‘অভিনবত্ব’ সম্পর্কে লেখক স্পষ্ট দাবি করেছেন কি না এবং করলে সেটা সত্যি কি না।

এসব কিছু যাচাই-বাচাই করার পর সিদ্ধান্ত নিন, এটা কেমন পেপার হয়েছে, দাবিগুলো ধোপে টিকছে কি না। তার পর চার অংশে রিভিউ লিখুন।

- ১) পেপারের সারমর্ম : এক প্যারাগ্রাফ, সাত-আট বাক্যে।
- ২) পেপারের ভালো দিক।
- ৩) পেপারের দুর্বল দিক।
- ৪) লেখকের জন্য পরামর্শ।

৪ নম্বর অংশটা কনফারেন্সে বা জ্ঞানালের পেপার রিভিউ লেখার সময় প্রযোজ্য। কারণ রিভিউ মানে কিন্তু আপনার জ্ঞান জাহির করার জায়গা না; বরং লেখকের লেখার মান বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার পরামর্শ। কাজেই মার্জিতভাবে লিখুন, পেপার জঘন্য হলেও ‘তুমি লিখতেই জানো না কিছু’ বা ‘এটা কিছু হলো’ না বলে বরং বলুন, কীভাবে পেপারটার মান বাড়ানো সম্ভব।

সবশেষে বলি, রিভিউয়ার হিসেবে আপনাকে হতে হবে চরম সন্দিহান। পেপারের লেখক যত বড় জ্ঞানী-গুণীই হোন না কেন, তাঁর দায়িত্ব হলো একটা সুলিখিত পেপারের মাধ্যমে সঠিকভাবে তথ্য দেওয়া, প্রমাণ করা। পেপারের কাজটা যে সঠিক, তা প্রমাণের দায়টা লেখকের। এমন মাইন্ডসেট নিয়েই পেপারটা রিভিউ করতে বসুন।

রিভিউ বা সার্ভে আর্টিকেল লেখা

যেকোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে আসলে প্রথমে সে বিষয়ের আদ্যোপান্ত জানতে হবে। এটা একেবারেই আবশ্যিকীয় ব্যাপার। কারণ-

(১) আপনার তো আগে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হবে, তবেই না নতুন কিছু বলতে পারবেন, তাই না?

(২) আগে কে কী কাজ করেছে, তা না জানলে হয়তো আপনি নতুন করে চাকা আবিক্ষারের মতোই অনেক খেটেখুটে এমন কিছু বের করবেন, যা আগেই কেউ করে ফেলেছে। কাজেই সময়টা নষ্ট হবে। এবং

(৩) আপনার পরবর্তী পেপারে আলোচনা করে দেখাতে তো হবে, অন্যদের কাজের চেয়ে আপনার কাজটা আলাদা কেন, সে সময় ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়া কাজ সম্পর্কে যদি বলতে না পারেন, তাহলে কিন্তু রিভিউয়ার ধরে নেবে, এ এলাকায় আপনার জ্ঞান সীমিত।

রিভিউ বা সার্ভে করার শুরুত্বটা তো বোঝা গেল, কিন্তু সেটাকে আর্টিকেল আকারে লেখার দরকারটা কী? মৌলিক গবেষণাপত্রের চেয়ে এরকম সার্ভের শুরুত্ব অনেক কম বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকম সার্ভেকে একটা আর্টিকেল বানিয়ে লিখে ফেলাটার দরকার আছে। কারণ না লিখলে আপনি যা সার্ভে করেছেন, সেটা আপনার নিজের কাছেও পরিষ্কার হবে না। অনেক জার্নালেই সার্ভে আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়। আর আরেকটা বড় কারণ হলো এরকম সার্ভে আর্টিকেলের শুরুত্ব অনেক বেশি: অনেক মানুষ ওটা পড়বে। তার চেয়েও বড় কথা, সেটাকে সাইট করবে।

রিভিউ ধরনের নিবন্ধ লিখবেন কী করে? প্রথমেই আপনার গবেষণার বিষয়ের চাবিশব্দ (key word) শুল্ক দিয়ে শুগল স্কলার, স্কোপাস (scopus) বা পাবমেড এরকম আপনার এলাকার রিসার্চ ডেটাবেজে সার্চ করুন, কী

কী পেপার আসে। এর মধ্যে যেসব পেপার সাম্প্রতিক এবং অনেকবার সাইট করা হয়েছে, সেরকম পেপারগুলো আপনার তালিকায় নিন। সেগুলো পড়ে ফেলুন, মূল বিষয় নিজের ভাষায় এক পাতায় লিখে ফেলুন প্রতিটা পেপারের জন্য।

তার পরের ধাপে এসব পেপারে অন্য যেসব পেপারকে সাইট করা হয়েছে, সেগুলো তালিকা করুন এবং সেগুলোও পড়ে সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন।

এ ধারাটা চালু রাখুন, মানে যেকোনো পেপার পড়ার পরে সেই পেপারে আলোচিত অন্য পেপারগুলোকেও পড়ে ফেলতে থাকেন।

মোটামুটি দিনে দুই-তিনটা করে পেপার পড়তে হবে অন্তত। এভাবে মাস খানেক পড়ার পরে এ এলাকার সব রিসার্চ সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা হবেই। আর প্রতিটি পেপার পড়ার সময় তার সারমর্ম, ভালো, খারাপ দিক, এসব যদি এক পাতায় লিখে ফেলে থাকেন, তাহলে আপনার হাতে মাস শেষে খুব বিশাল একটা সারমর্ম থাকবে, সরকিছু এক করলে এ এলাকার রিসার্চ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

কাজটা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সব রিসার্চ সম্পর্কে জানার পরে আপনার কাজ হবে সেগুলোকে নানা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা। প্রতিটি ক্যাটাগরির নানা কাজকে তুলনা করা, নানাভাবে বিভিন্ন রিসার্চের ভালো-খারাপ দিক তুলনা করে আলোচনা করা। সেটা আবশ্যিকীয় অংশ যেকোনো রিভিউ পেপারের। কারণ রিভিউ পেপারের উদ্দেশ্য হলো পাঠককে কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া।

আরও কিছু টিপস : রেফারেন্স ম্যানেজের জন্য বিবটেক্স (BibTeX) বা এন্ডনোট (EndNote) বা অনলাইন সাইটেশন ম্যানেজার ব্যবহার করুন। না হলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

প্রতি পেপারের সারমর্ম প্লেন টেক্সট ফাইলে রাখাই ভালো, তাতে করে একত্র করতে সুবিধা হবে।

সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখবেন। দয়া করে আলসেমি করে কোনো পেপার থেকে কপি পেষ্ট মারবেন না। সেটা করলে প্রেজিয়ারিজন বা লেখাচুরির দায় আসবে আপনার ওপর, যা খুব ভয়াবহ অভিযোগ।



আইডিয়াবাজি, সমাধান ও যাচাই করা

আইডিয়া পাবেন যেতাবে

গবেষণার একটা বড় অংশ হলো নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করা। যদি আপনার গবেষণাটা হয় কোনো সমস্যার নতুন সমাধান বের করা, তাহলে সে জন্য আপনার অভিনব কিছু একটা করে দেখাতে হবে।

প্রশ্ন হলো, আইডিয়াটা পাবেন কোথা থেকে?

আইডিয়া পেতে হলে আপনাকে ভাবতে হবে। আপেলগাছের তলায় বসে থেকে নিউটনের মাথায় আপেল পড়তে পারে, তা থেকে যুগান্তকারী আবিষ্কারও হতে পারে, কিন্তু আপনার মাথায় কতবেল পড়ার অপেক্ষায় কি কতবেলগাছের তলায় আস্তানা গাড়বেন? নাহ, আইডিয়া পাওয়ার জন্য বেলগাছ, আমগাছ কিংবা আপেলগাছ আবশ্যিকীয় না; বরং আসলে দরকার একটু চিন্তা করা। আর কল্পনাকে একটু বল্লাহীন ঘোড়ার মতো ছুটতে দেওয়া।

প্রথাগত পদ্ধতিতে সমাধান করা যায়নি বলেই আপনার বেছে নেওয়া গবেষণার সমস্যাটির সমাধান এখনো বের হয়নি, তাই না? সমাধানটা যে খুব জটিল হতে হবে, তা কিন্তু সব সময় খাটে না; বরং অনেক সময়ই সমস্যাটার সমাধান হতে পারে খুব সহজ, চোখের সামনেই, একবার দেখানোর পরে মনে হতে পারে খুব সহজ।

গুগলের এক সম্মেলনে একবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল শিক্ষক কর্মের পক্ষ থেকে। সেখানে আমাদের একেবারে হাতে ধরে শেখানো হয়েছিল, কী করে ব্রেইনস্টৰ্মিং করতে হয়, কী করে চিন্তার সীমাটা করতে হয় অনেক বিস্তৃত। সেখানে শুরু হয়েছিল ছোট্ট একটা ভিডিও দিয়ে, ভিডিওতে প্রথমে বলা হয়েছিল একটা সমস্যা। বাইসাইকেল চালাতে গেলে নিরাপত্তার জন্য হেলমেট পরা দরকার। কিন্তু হেলমেট সঙ্গে বহন করা ঝামেলা। আবার হেলমেট পরলে খ্যাত লাগে বলে অনেকে ফ্যাশন করে হেলমেট পরেন

না। ফলে হেলমেটবিহীন সাইকেল আরোহীরা সাইকেল উল্টে পড়ে প্রায়ই মাথায় আঘাত পান। মারাও যান অনেকে। এ সমস্যাটা কীভাবে দূর করা যায়।

সমস্যাটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমাদের বলা হলো, এর সমাধান খুব দ্রুত চিন্তা করতে। হাতে ছোট ছোট কার্ড ধরিয়ে দিয়ে সমাধান মাথায় যা যা আসে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব লিখতে বলা হলো। তারপর বলা হলো সমাধানগুলো খুব দ্রুত মূল্যায়ন করে কোনটা ভালো, সেটা ঠিক করতে।

পরের ধাপে ১০ মিনিট করে সময় পেলাম, সমাধান যে কটা ভালো লেগেছে, তার মধ্যে একটাকে ছবি এঁকে এক পাতা কাগজের মধ্যে ব্যাখ্যা করতে।

একেক জনের মাথায় আসলে একেক সমাধান এল। কেউ বলল, সাইকেলটা যাতে উল্টে না যায়, সেই ব্যবস্থা করতে, সাইকেলের সঙ্গে আরও কিছু চাকা জুড়ে দিয়ে। অথবা সাইকেলের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য একটা যন্ত্র জুড়ে দিয়ে, জাইরোস্কোপ দিয়ে সাইকেল সোজা আছে কি না, তা বের করে সেই অনুযায়ী ভারসাম্য বজায় রাখবে।

আবার কেউ বলল, গাড়ির নিরাপত্তার জন্য এয়ার ব্যাগ যেমন থাকে, সেরকম সাইকেলেও কিছু একটা দেওয়া। অ্যাক্সিডেন্ট হতে শুরু করলেই চটজলদি রাবারের বালিশ-টাইপের কিছু চালকের পাশে এসে যাবে। ব্যথা পাবেন না চালক।

আসল সমাধান কী, তা না হয় পরেই শুনলেন, কিন্তু গুগল এখানে আমাদের যে পদ্ধতি শেখাল, সেটা কি খেয়াল করেছেন?

প্রথম ধাপ : অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে সমস্যাটা নিয়ে চোখ বুজে চিন্তা করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : সমাধান মাথায় যা আসে, সেগুলোকে লিখে ফেলতে হবে কাগজে।

তৃতীয় ধাপ : সমাধানগুলোর মূল্যায়ন করে সেগুলোর মধ্যে সেরা কয়েকটি সমাধান বেছে নিতে হবে।

চতুর্থ ধাপ : সমাধানটাকে একটা কার্টুন বা ছবির আকারে কাগজে লিখে বোঝাতে হবে। অন্যদের না বোঝালেও নিজেকে বোঝানোর জন্য হলেও এই ধাপটা করতে হবে।

এই ধাপগুলোর মাধ্যমে আসলে খুব গুছানোভাবে সৃজনশীল চিন্তা করা সম্ভব এবং আপনার গবেষণার সমস্যাটি সমাধানের দিকে পারবেন আগামে।

আগেই বলেছি, গবেষণার সমস্যা সমাধানের জন্য মোক্ষম আইডিয়া পেতে হলে মনের, কল্পনার সীমাটা করতে হবে বহুদূরে বিস্তৃত। সেটা করবেন কীভাবে? তা করতে হলে আপনাকে আগে থেকে কিছু অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সেটা একেকজনের ক্ষেত্রে একেকভাবে সম্ভব হলেও মোটের ওপরে কিছু কাজের পরামর্শ দিচ্ছি, সেগুলো মেনে চললে আশা করি কল্পনাশক্তিটা বাড়বে প্রচুর। তো, পরামর্শগুলো কী? আসেন দেখি এক এক করে—

পড়ুন: পড়ার কোনো বিকল্প নাই। আর সেই পড়াটা পাঠ্যবইয়ের বাইরেও হতে হবে। নিয়মিতভাবে পত্রিকার বিজ্ঞান প্রযুক্তির পাতা, নানা প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট, এসব পড়ার অভ্যাস করুন। কোনো কিছু কেন হয়, কীভাবে হয়, সেসবের সমাধান বা ব্যাখ্যা সরাসরি না পড়ে আগে নিজের চিন্তা করে দেখুন, কিছু মাথায় আসে কি না। সায়েন্স ফিকশন, কল্পকাহিনি পড়ুন। বাংলাদেশে ‘আউট বই’ পড়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের বিশাল অ্যালার্জি আছে। সেটা আসলে দীর্ঘমেয়াদি কল্পনাশক্তির জন্য ক্ষতিকর— ভালো করে চিন্তা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কল্পনার জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

দেখুন: আপনার গবেষণা যদি কারিগরি কিছু নিয়ে হয়, তাহলে আপনার কল্পনার দৌড় বাড়াতে পরামর্শ দেব সায়েন্স ফিকশন সিরিজ দেখতে। উদাহরণ হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় টিভি সিরিজ স্টার ট্রেকের কথা বলব। এই সিরিজটি ১৯৬০-এর দশকের, কিন্তু এখানে সেই সময়ই দেখানো হয়েছিল মোবাইল ফোনের মতো কমিউনিকেটর, চিকিৎসার জন্য হাতে বহনযোগ্য ট্রাইকর্ডার নামের স্ক্যানার— এসব। এটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৮০-এর দশকে তৈরি করা হয় মোবাইল ফোন। আর বর্তমানে চেষ্টা চলছে চিকিৎসকদের খুব কাজে আসবে এমন হাতে বহনযোগ্য এবং সব রকমের সমস্যা স্ক্যান করতে পারে এমন যন্ত্র ট্রাইকর্ডার। আসলে বিজ্ঞানীরা এসব কল্পবিজ্ঞানের নানা কাহিনির মধ্যে বর্ণিত নানা যন্ত্র দেখে আইডিয়া পেয়েছেন এবং সেটাকেই বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন।

আলোচনা করুন: এর বিকল্প একেবারেই নাই। একজনের মাথার চেয়ে দুই বা আরও কয়েকজনের মাথা অনেক ভালো। তাই আইডিয়া নিজের মনের মাঝে রাখলে যতটা কাজ দেবে, তার চেয়ে বন্ধু, সহপাঠী, এমনকি

স্বজনদের সঙ্গে কথা বললে আরও অনেক বেশি মাথা খুলবে। কাজেই পেটের ভেতরে কথা চুকিয়ে না রেখে, সেটা নিয়ে খোলা মনে আলোচনা করুন, একসঙ্গে মিলে করুন ব্রেইনস্টোর্মিং। অথবা কাউকে সমস্যাটা ব্যাখ্যা করে বোঝান। হয়তোবা আপনি দেখতে পারছেন না, এমন কোনো দিক থেকে সমস্যার সমাধান অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যাবেন।

লিখুন : সমস্যাটার সমাধান নিয়ে লিখতে থাকুন। রিসার্চ নোটবুকের মধ্যে আঁকিবুঁকি করুন। নানা ইস্যু লিখে রাখুন। এভাবে নিজের মনে সমস্যার নানা দিক নিয়ে লেখালেখি করতে করতে একসময় হয়তো নতুন কিছু পাবেন।

শিখুন : গোগ্হাসে নানা বিষয় শিখে নিন। হয়তো আপনি অন্য কোনো বিষয়ে শিখেছেন, এমন কোনো আইডিয়া এই সমস্যা দূর করতে কাজে লাগাতে পারবেন।

এতক্ষণে আপনাদের মনে নিশ্চয় প্রশ্নটা জেগেছে, বাইসাইকেলের হেলমেটের সমস্যাটার সমাধান কীভাবে হলো? জবাব দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে বলুন তো, আপনার মাথায় কী সমাধান এসেছে?

ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। এই সমস্যাটার সমাধান সেই গবেষক যেভাবে করেছিলেন তা হলো, একটা এয়ারব্যাগের মতো কলার বানিয়ে। ভেতরে সেপর দেওয়া আছে। দেখতে অনেকটা স্কার্ফ বা মাফলারের মতো। সাইকেলচালক সেটাকে স্কার্ফের মতো করে গলায় পেঁচিয়ে সাইকেল চালাতে পারেন। এমনিতে মাথা খোলাই থাকে। কিন্তু যখনই ঝাঁকুনি লাগে, চালক পড়ে যান সাইকেল থেকে, এক সেকেন্ডের অনেক অনেক কম সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে এই জিনিসটা, চালকের মাথাকে ঘিরে একটা বালিশের মতো জিনিস ফুলে উঠে ঘিরে ফেলে। ফলে চালক মাটিতে পড়তে পড়তে হেলমেটের মতোই একটা বেষ্টনী দিয়ে মাথাটা রক্ষা পায়। আগ্রহীরা The Invisible Bicycle Helmet নামের ভিডিওটি ইউটিউবে খুঁজে নিতে পারেন।

কেমন লাগল সমাধানটা? গুছিয়ে, কাঠামোবন্ধভাবে মাথা খাটিয়ে এবং নিজের কল্পনাশক্তিকে ঠিকমতো বল্লাহীনভাবে ছেড়ে দিতে পারলে আপনিও এরকম চমৎকার সমাধান বের করতে পারবেন।

আইডিয়াবাজির মজাই এটা।

আইডিয়াকে চিত্তাকর্ষকভাবে লিখবেন যেতাবে

আপনার একটা দারুণ আইডিয়া আছে, সেটা অন্যদের বোঝাতে বা জানাতে চান, কাউকে সেই আইডিয়াটা দিয়ে কনভিন্স করতে চান, কিন্তু কীভাবে? বিজনেস প্রপোজাল আছে, ইনভেষ্টরকে সেটা বোঝাতে চান, যাতে তিনি বিনিয়োগ করেন আপনার ব্যবসায়।

রিসার্চ করতে চান, প্রফেসরকে আপনার আইডিয়া বা রিসার্চ প্রপোজালটা ব্যাখ্যা করতে চান, যাতে তিনি আপনাকে তার গ্রন্থে নেন কিংবা ফাস্ডিং দেন।

এ ব্যাপারটা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই করা লাগে। ছাত্রদের থিসিস, রিপোর্ট, পেপার ইত্যাদি কিংবা রিসার্চ পেপারে তাদের আইডিয়া প্রকাশ করতে হয়। আবার প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময়ও আপনার আইডিয়া কাউকে ‘খাওয়ানোর’ দরকার হতে পারে। দোকানে কিছু কিনতে গেলে দেখবেন, দোকানদার নানা কৌশলে আপনাকে তার জিনিস গোছানোর চেষ্টা করছে। খেয়াল করে দেখবেন, কেউ কেউ এ কাজটা খুব ভালো করে পারে, আবার কেউ কেউ খাবি খায়।

এর রহস্যটা কী?

আসলে এই আইডিয়া প্রেজেন্টেশনের কাজটা খুব সিস্টেম্যাটিকভাবে করা সম্ভব। আপনার মনের চিন্তাগুলোকে নির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করলে সেটা আপনার টাগেট অডিয়েন্সের মনোযোগ পেতে বাধ্য। কয়েক মাস আগে একটা ওয়ার্কশপে গিয়েছিলাম। সেখানে এ ব্যাপারে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনসিটিউট তথা এসআরআই ইন্টারন্যাশনালের কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলো। ইনোভেশন বা নিত্য নতুন উভাবনের ক্ষেত্রে এ সংস্থাটি সারা বিশ্বে বিখ্যাত। কম্পিউটারের মাউস থেকে শুরু করে আইফোনের Siri, সবই এদের বানানো।

আইডিয়া উপস্থাপনের জন্য SRI-এর খুব সহজ একটা ফরমুলা আছে।
মনে রাখাও সহজ, NABC

N=Need

প্রথমেই বলতে হবে অল্প কথায়, সমস্যাটা কী, আপনি কী নিয়ে কথা
বলছেন এবং বর্তমানে কোন জিনিসের ঘাটতি আছে।

A=Approach

এবারে বলুন আপনি কীভাবে সেটার সমাধান করবেন। আপনার প্রস্তাবনাটি
কী?

B=Benefits

আপনার প্রস্তাবিত কাজের সুবিধা কী কী?

C=Competition

আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেই। তাদের কাজ বা জিনিস কেন ভালো না বা
আপনারটা কেন তাদেও চেয়ে ভালো, সেটা এখানে অল্প কথায় বলবেন।

ব্যস, হয়ে গেল। এই ফর্মুলাতে খুব সহজেই আইডিয়া উপস্থাপন করতে
পারেন। এটা ১০ পৃষ্ঠার রিসার্চ পেপারও হতে পারে অথবা ২০ সেকেন্ডের
Elevator pitch হতে পারে। এ ফরমুলাটি বহুদিন ধরে পরীক্ষিত। আর
এলোমেলোভাবে চিন্তা না করে এভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন আপনার
চিন্তাধারা, লিখতে পারেন আপনার রিসার্চ পেপার, প্রস্তাবনা বা বিজনেস
প্রপোজাল।

আইডিয়া ও সমাধান যাচাই

গবেষণার সমস্যাটির সমাধান করতে গিয়ে ভালো একটা আইডিয়া যদি পান, তাহলে পরের ধাপ হলো সেই আইডিয়াটা যাচাই করে দেওয়া। আসলেই কি এ তত্ত্বটি সত্য? অথবা সমাধানের যে উপায় খুঁজে বের করেছেন, সেটা দিয়ে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব?

এই প্রশ্নের জবাব বের করতে হলে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো এক্সপেরিমেন্ট তথা পরীক্ষণ। গবেষণার এই ধাপে আপনার বের করা আইডিয়া বা তত্ত্বকে বাস্তবতার সাপেক্ষে যাচাই করে দেখতে হবে। এখানে ধরে নিছি আপনার গবেষণাটির ফোকাস হলো কোনো সমস্যার সমাধান খোঁজা। যদি আপনার গবেষণাটি হয় বিশ্লেষণধর্মী বা অনুসন্ধানী, মানে আপনি কোনো কিছুর কারণ বের করতে চান, তাহলেও কিন্তু আপনাকে পরীক্ষণ চালাতে হবে।

পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে কী যাচাই করবেন? যদি নতুন কোনো সমাধান বের করেন, তাহলে পরীক্ষালুক ফলাফল যাচাই করে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যেমন—

- আপনার দেওয়া সমাধানটি কি আদৌ সমস্যাটির সমাধান করতে পেরেছে?
- আপনার দেওয়া সমাধানটি কি অন্যান্য সমাধানের চেয়ে দ্রুত কাজ করে?
- আপনার দেওয়া সমাধানটি কি অন্যান্য সমাধানের চেয়ে ভালো বা নিখুঁত ফলাফল দেয়?
- আপনার দেওয়া সমাধানটি কি অন্যান্য সমাধানের চেয়ে কম খরচের?

ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষালক্ষ ফলাফল যাচাই করে ওপরের প্রশ়ঙ্গলোর জবাব আপনি বের করবেন গ্রাফ বা ছবি এঁকে অথবা ছক আকারে।

আগের চেয়ে ভালো বা দ্রুত বা নিখুঁত বা সন্তা এরকম দাবি করার সময়ে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে কি না পরীক্ষার ফলাফলের, তাও উল্লেখ করতে হবে (সে জন্য স্ট্যাটিস্টিকসের প্রাথমিক ধারণা রাখা দরকার)।

আবার যদি পরীক্ষার বা উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো কিছুর কারণ-সংক্রান্ত ধারণা বের করতে চান, তাহলে আপনাকে দেখতে হবে আপনার অনুকল্প বা হাইপোথিসিসটির সঙ্গে উপাত্তের মিল কর্তৃক। সে জন্য আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল বানিয়ে সেখানে উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হবে।

আর যদি আপনার গবেষণাটি হয় তথ্য বা জ্ঞান আহরণমূলক অর্থাৎ কোনো অজানা বিষয় সম্পর্কে জানা, সে ক্ষেত্রে আপনি যা ধারণা করেছেন, তা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে কি না, তা যাচাই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষণগুলো অনেকটা কোয়ালিটেটিভ অর্থাৎ বর্ণনামূলক হবে।

এভাবে যাচাই করার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার গবেষণার ফলাফল কতটা কার্যকর। আর একাধিক আইডিয়া থাকলে সেগুলোও এই পরীক্ষণের মাধ্যমেই তুলনা করে দেখতে পারবেন।

আইডিয়া ও সমাধান যাচাইয়ের পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই অংশটির ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। সে জন্য খুব সাবধানে এবং যত্নের সঙ্গে এই পর্যায়ের কাজ করতে হবে।



গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন

গবেষণার ফল প্রকাশ

গবেষণার ফল প্রকাশ করার মূল মাধ্যম হলো গবেষণাপত্র বা research paper। আর সেটা প্রকাশ করতে হয় কনফারেন্স অথবা জার্নালে। আপনার গবেষণার ফলাফলকে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে লিখে জমা দেওয়ার পরে সেটা যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকাশিত হয়।

পেপার প্রকাশের নানা ধাপ

প্রতিটি জার্নাল কিংবা কনফারেন্সে পেপার জমা দেওয়ার সাইট থাকে। সেখানে তারা যে ফরম্যাটে লেখা প্রকাশ করে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া থাকে, যা থেকে আপনি জানতে পারবেন কত পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে হবে, মার্জিন কেমন হতে হবে, নানা সেকশন হেডিং, সাইটেশন স্টাইল— এসব কেমন হবে, ফন্ট সাইজ— সবকিছুই। যেখানে পেপারটা পাঠাচ্ছেন, সেখানকার সব নির্দেশনা হ্রাস মেনে চলতে হবে। কারণ অনেক সময় আপনার পেপারের সবকিছু ঠিক থাকলেও ফরম্যাটের সমস্যার কারণে পেপার প্রত্যাখ্যাত বা রিজেক্টেড হতে পারে।

সব ফরম্যাট ও নির্দেশনা মেনে পেপার প্রস্তুত করার পরে সেটা জমা দিতে হবে কনফারেন্স বা জার্নালের সাইটে। কনফারেন্সে পেপার জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বা ডেডলাইন থাকে। তার আগে জমা দিতে হবে পেপারটা সেখানে। বর্তমানে সব জার্নাল বা কনফারেন্স ইলেক্ট্রনিক সাবমিশন অর্থাৎ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেপার জমা নেয়।

পেপার জমা দেওয়ার পরে সেটা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা সেই পেপারটিকে রিভিউ বা যাচাই-বাছাই করবেন। কনফারেন্সের ক্ষেত্রে একটি প্রোগ্রাম কমিটি থাকে, যা সেই বিষয়ের অভিজ্ঞ গবেষকদের নিয়ে গঠিত হয়। আর জার্নালের ক্ষেত্রে জার্নালের সম্পাদক নির্ধারণ করেন কোনো অভিজ্ঞ

গবেষকেরা এই পেপার রিভিউ করবেন। সাধারণত একটি পেপার দুই থেকে চারজন বিশেষজ্ঞ রিভিউ করে থাকেন।

পেপার রিভিউ করা শেষে রিভিউয়ারেরা সেই পেপারের ভালো-খারাপ সবদিক মিলে একটি রিপোর্ট বা রিভিউ লেখেন এবং পেপারটি গ্রহণযোগ্য কি না, সে ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তটি দেন। পেপারটির মান সম্পর্কে সবাই একমত হলে তবেই এটি প্রকাশের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্পূর্ণ এ পদ্ধতিটিকে বলা হয় Peer review (পিয়ার রিভিউ)।

অনেক সময়ে রিভিউয়ারেরা পেপারের কিছু সমস্যা নির্দেশ করে, সেগুলোকে সংশোধন করার জন্য লেখকদের সুযোগ দেন। সংশোধন শেষে আবার আরেকবার রিভিউ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পিয়ার রিভিউয়ের প্রসেসে মোট সময় লাগতে পারে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত। সাধারণত কনফারেন্সে নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে— এক মাস থেকে তিন-চার মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানা যায়। তবে অধিকাংশ জার্নালে অনেক সময় লাগে রিভিউ করতে, যা তিন মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে।

পেপার যদি মানসম্মত না হয়, সে ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান বা রিজেকশনের সিদ্ধান্তসহ রিভিউয়ারদের মতামত লেখকের কাছে পাঠানো হয়। আর গ্রহণযোগ্য হলে নির্দিষ্ট সময় পরে পেপারের তৃতীয় সংস্করণ জমা দিতে হয়।

পোস্টার অথবা এক্স্টেন্ডেড অ্যাবস্ট্রাক্ট

অনেক ক্ষেত্রে পেপারের বদলে পোস্টার হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ প্রকাশ করা যায়। সে ক্ষেত্রে সাধারণত এক বা দুই পৃষ্ঠায় পোস্টারের বর্ণনাকে বর্ধিত ভূমিকা বা এক্স্টেন্ডেড অ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে জমা দিতে হয়।

উপস্থাপনা

জার্নালের ক্ষেত্রে কাজ এখানেই শেষ। কিন্তু কনফারেন্সের ক্ষেত্রে আরেকটি ধাপ বাকি আছে, যা হলো কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অন্যান্য গবেষকের সামনে পেপারটি উপস্থাপন করা। সে ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২৫ মিনিটের একটি প্রেজেন্টেশন বানাতে হয়, যা মধ্যে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হয়।

উপস্থাপনার মাঝে বা শেষে উপস্থিত গবেষকেরা গবেষণাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন, তার জবাব দেওয়ার জন্য থাকতে হবে প্রস্তুত।

কনফারেন্স নাকি জার্নাল?

কোথায় পাঠাবেন আপনার গবেষণার কাজ? আসলে এই প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে আপনার গবেষণার এলাকার প্রথার ওপর। জার্নাল অবশ্যই সব ক্ষেত্রে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ধরনের প্রকাশনা। তবে সময়সাপেক্ষ বলে শুরুর দিকের কাজ অনেক ক্ষেত্রেই কনফারেন্সে পাঠানো হয়। কনফারেন্সে পাঠানোর একটা সমস্যা অবশ্য হলো, যাতায়াত ও অংশগ্রহণের খরচ। অধিকাংশ কনফারেন্সে রেজিস্ট্রেশন ফি থাকে, যা কয়েক শ ডলার হতে পারে। আর কনফারেন্স যদি হয় বিদেশে, তাহলে ফ্লেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া, সবই বহন করতে হবে, যা সব মিলে হাজার খানেক ডলারের বেশি হতে পারে। কাজেই সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন কোথায় পাঠাবেন।

গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার লিখিবেন যেভাবে

নবীন গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার একটি ভৌতিক অংশ হলো গবেষণালক্ষ ফলাফলকে গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার আকারে লেখা। আমার পিএইচডি বা মাস্টার্সের ছাত্রদের হাতে ধরে ধরে সেটা শেখাই। এ অধ্যায়ে কীভাবে রিসার্চ পেপার লেখা শুরু করতে হবে, তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখছি।

রিসার্চ পেপারের মূল উদ্দেশ্য হলো গবেষণায় কী পেয়েছেন, সেটা সংক্ষিপ্ত আকারে জানানো। খেয়াল রাখিবেন, আপনি হয়তো বছর খানেক কাজ করেছেন, তাই সবকিছুর খুঁটিনাটি জানেন ঠোঁটস্থভাবে, কিন্তু পাঠকের সেই গভীর জ্ঞান না-ও থাকতে পারে। কাজেই রিসার্চ পেপারের শুরুটা করতে হবে গবেষণার বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিত বা background নিয়ে আলোচনা করে।

পেপারের শুরুতেই থাকে abstract বা সারাংশ। এ অংশটি পাঁচ-ছয়টি বাক্যের বেশি হওয়া উচিত নয়। এই অংশের কাজ হলো গবেষণাপত্রটির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা খুব অল্প জায়গায়। যেমন— সমস্যাটা কী, তার সমাধান করলে লাভ কী, আপনি কী করেছেন, এবং এই পেপারে কী তথ্য বা ফলাফল বা প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে, সেটা। অনেকেই এ অংশটি অতি দীর্ঘায়িত করে ফেলেন। এটা ঠিক নয়। অনেক কনফারেন্স বা জার্নালে অবশ্য শব্দসীমা বেঁধে দেওয়া থাকে, তার চেয়ে বেশি দেওয়া যায় না। আপাতত এ অংশটিতে সর্বোচ্চ ছয় বাক্য থাকবে এটাই লক্ষ্য স্থির করবেন।

এবার পেপারের মূল অংশ। পেপারের শুরুতে সাধারণত ভূমিকা বা introduction সেকশন থাকে, শেষে থাকে উপসংহার বা conclusion। ভূমিকাতে মূল সমস্যা নিয়ে, পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বলতে হবে। স্ট্যানফোর্ডের ইনফোল্যাবের প্রফেসর জেনিফার উইডোমের এ নিয়ে দারুণ একটা ফরমুলা আছে, সেটা এরকম। ভূমিকাতে পাঁচটি অংশ থাকবে—

- সমস্যাটা কী?
- সেটা সমাধান করা কেন দরকার (কী লাভ হবে এটা করে)?
- সমস্যাটা সমাধান করা কেন কঠিন?
- আপনি কী করছেন সেটা সমাধানে? এবং,
- অন্যরা কী করেছে, তার চেয়ে আপনার পদ্ধতির সুবিধা কী কী?

কাজে ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় পাঁচটা প্যারা লিখবেন অন্তত, ওপরের পাঁচটা পয়েন্ট নিয়ে।

এরপর থাকতে পারে background বা motivation অংশ, যেখানে এই পেপারের বিষয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা সংক্ষেপে দেওয়া হবে। মূলত কনসেপ্ট বা ধারণাগুলো সংক্ষেপে লিখে সেসব বিষয়ের নানা পেপারের সাইটেশন দিতে হবে।

এবাবে আসবে আপনার পেপারের টেকনিক্যাল বা কারিগরি অংশটি। পেপার কিসের ওপরে, তার ওপরে নির্ভর করবে এখানে কী থাকবে। এই অংশে সিস্টেম ডিজাইন বা আর্কিটেকচার থাকতে পারে, থিওরির অংশ থাকতে পারে, এক্সপেরিমেন্টাল ম্যাথডলজি থাকতে পারে ইত্যাদি। অবশ্যই চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে।

পরের অংশে থাকবে আপনার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট বা ফলাফল ও তার বিশ্লেষণ। এখানে ফলাফল উপস্থাপন (ছক বা চিত্র) করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই ফলাফল ব্যাখ্যা করা। ডিসকাশন বা আলোচনা অংশে অনেক জোর দিতে হবে। ফলাফল ভালো হলে তো বটেই, খারাপ হলে এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও দিতে হবে।

রিলেটেড ওয়ার্ক বা এ বিষয়ে অন্যেরা কে কী কাজ করেছেন, সেটার অবস্থান নিয়ে একটু দ্বিমত আছে। কেউ কেউ পেপারের সব শেষে সেটা দিতে পছন্দ করেন। আবার কেউ কেউ পেপারের শুরুতে। পেপারের বিষয়ের ওপরেও অনেক ক্ষেত্রে এটা নির্ভর করে। তবে এই অংশের মৌদ্দা কথা হলো, অন্যেরা কে কী কাজ করেছে তা উল্লেখ করা এবং বিনয়ের সঙ্গে তাদের কাজের সঙ্গে আপনার কাজের পার্থক্য বা সুবিধাগুলো উল্লেখ করা। (বিনয়ের সঙ্গে করাটা গুরুত্বপূর্ণ, অমুকের কাজ ‘জঘন্য’ এই টাইপের কিছু

কখনোই লিখতে যাবেন না!)। পার্থক্যগুলো ছক আকারে দিতে পারলে ভালো হয়।

সবশেষে আসে conclusion বা উপসংহার। এ অংশে থাকবে এই পেপারে কী পড়লেন পাঠক, তার ওপরে কিছু কথা। এ অংশে এই পেপারে কী কাজ দেখানো হয়েছে, তা ছাড়াও এই কাজের ভিত্তিতে কী সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে আপনি আর কী করতে পারেন (future work) সে বিষয়ে বলা চলে।

এবং সবশেষে bibliography/reference এ অংশটি তো থাকছেই, যেখানে আপনার সাইট করা সব পেপারের তথ্য দিতে হবে।

ব্যস, এই নিয়মগুলো মেনে চললেই লিখতে পারবেন রিসার্চ পেপার। মনে রাখবেন, পাঠক কিন্তু আপনার চেয়ে কম জানেন এ বিষয়টা, কাজেই আপনার কাছে জলবৎ তরলং জিনিসও আসলে বুঝিয়ে বলতে হবে।

রিসার্চ পেপার আসলে গল্প বলা— আপনার রিসার্চকে সহজে বুঝিয়ে বলা। কীভাবে শুরু করবেন তার হদিস এখনো না পেলে এক কাজ করুন, আপনার মা বাবা বউ ভাই বোন বন্ধু— এমন কেউ যে এ বিষয়ে কিছুই বোঝে না, তাকে ১০ মিনিটে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন। তার পর কীভাবে বোঝালেন, সেটাকেই ভাষায় লেখেন ওপরের কাঠামো অনুসারে।

জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ

জার্নাল বা গবেষণা সাময়িকীতে গবেষণাপত্র প্রকাশ করাটা অধিকাংশ জায়গায় খুব শুরুত্তের সাথে দেখা হয়। প্রতিটি এরিয়াতেই কিছু জার্নাল আছে, যেখানে কোনো গবেষণা প্রকাশ করতে পারাটা গবেষকদের কাছে স্বপ্নের মতো। যেমন— নেচার (Nature) নামের জার্নাল হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত জার্নালের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

জার্নাল নির্বাচন

শুরুত্তেই চিন্তা করে নিতে হবে কোন জার্নালে গবেষণাপত্রটি পাঠাবেন, সে ব্যাপারটি। জার্নালের নাম-ডাক বোর্ডের জন্য সেই জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কত, তা দেখে নিন। এটা হলো গড়ে ওই জার্নালের নিবন্ধগুলো অন্যত্র কতবার সাইট বা উল্লেখ করা হয়েছে, তার হিসাব। ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর যত বেশি, জার্নালের মান তত ভালো ধরা হয়। অবশ্য এটাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলীতে কারা আছেন, তারা কতটা বিখ্যাত, জার্নালটি কি কোনো প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে কি না, এই সবকিছু বিবেচনা করতে হয়। যেমন— কম্পিউটার-সংক্রান্ত প্রকাশনার ক্ষেত্রে ACM বা IEEE-এর জার্নাল/ট্রানজেকশন বেশি নাম করা। খুব খেয়াল রাখবেন, কোনো ভুঁইফোড় অখ্যাত জার্নালে যাতে আপনার গবেষণাপত্র না পাঠান। অনেক অসাধু প্রকাশক গালভরা নামের জার্নাল খুলে বসে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মান যাচাই ছাড়াই গবেষণাপত্র প্রকাশ করা, টাকার বিনিময়ে। এসব জায়গায় গবেষণাপত্র প্রকাশ হলে বরং আপনার নিজের মান সম্পর্কেই সবাই প্রশ্ন তুলবে। সে জন্য ভালো জার্নালেই কেবল লেখা প্রকাশ করবেন।

জার্নালের সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ

আপনার লেখাটি কি জার্নালের সাথে খাপ খায়? তা বোঝার জন্য জার্নালের সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করুন। নম্রভাবে আপনার নিবন্ধের মূল বিষয়টা সংক্ষেপে লিখে জিজ্ঞেস করুন, এটি কি এই জার্নালের থিমের সাথে খাপ খাচ্ছে কি না। দরকার হলে আপনার নিবন্ধের অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠাতে পারেন। সম্পাদক যদি বলেন এটি এই জার্নালের আওতায় পড়ে, তাহলে এটি সেখানে পাঠাতে পারেন। অবশ্য এটি অনেকটা অপশনাল একটি ধাপ। আপনি নিজে নিশ্চিত থাকলে এই ধাপের দরকার নাই।

জার্নালের নিয়মকানুন

প্রতিটি জার্নালের নিজস্ব ফরম্যাট থাকে। লেখা পাঠানোর আগে সেই ফরম্যাটে লেখাটি সাজিয়ে নিতে হবে। অনেক সময়ই সর্বোচ্চ কত পৃষ্ঠার নিবন্ধ পাঠাতে পারবেন, তাও বলা থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। তার সাথে সাথে অনেক জার্নালে শর্ত থাকে, নিবন্ধটি যদি কোনো কনফারেন্স নিবন্ধের পরিবর্ধিত সংস্করণ হয়, তাহলে কনফারেন্স নিবন্ধটির কপি পাঠাতে হবে এবং জার্নালের নিবন্ধটিতে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ নতুন লেখা থাকতে হবে। এসব শর্ত আগে থেকে দেখে নিন ও মেনে চলুন। দরকার হলে সম্পাদককে প্রশ্ন করে জেনে নিন।

জার্নালের রিভিউ সাইকেল

জার্নালে পাঞ্জলিপি জমা দেওয়ার পরে রিভিউ আসতে এবং প্রকাশ হতে কত দিন লাগতে পারে, সে ব্যাপারে জেনে নিন। অনেক জার্নালে এই সময়টা আসলে এক বছর বা তারও বেশি হতে পারে। আপনার কি এত সময় আছে? থাকতেও পারে, না-ও পারে। গবেষণার জগতের নিয়ম হলো, একটি নিবন্ধ কোনো জার্নাল বা কনফারেন্সে জমা দেওয়া হলে সিদ্ধান্ত আসার আগে পর্যন্ত আপনি সেটা অন্যত্র কোথাও জমা দিতে পারবেন না। তাই আপনাকে রিভিউ ও সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। রিভিউ সাইকেল কত লম্বা, সেটা অনেক সময় জার্নালের ওয়েবসাইটেই লেখা থাকে। সেখানে বলা না থাকলে জার্নালের সম্পাদককে জিজ্ঞেস করে নিন। অথবা জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত নিবন্ধগুলা কবে জমা দেওয়া হয়েছে এবং কবে প্রকাশিত হয়েছে, সেই তারিখগুলা জার্নাল থেকেই দেখে নিন।

রিভিউ বুরো ব্যবস্থা নেওয়া

জার্নালের রিভিউ যখন আসবে, তখন খুব ভালো করে সেটা পড়ে দেখুন। আপনার বিষয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার আপনার নিবন্ধটি পড়ে মতামত দিচ্ছেন। রিভিউ সাধারণত কয়েক রকমের হতে পারে—
বড়মাপের পরিবর্তন লাগবে (Major revision), হালকা-পাতলা
পরিবর্তন লাগবে (Minor revision), প্রত্যাখ্যান (Rejected) অথবা
প্রকাশের সুপারিশ (Accepted)। এর সাথে বিস্তারিত কারণ ও ব্যাখ্যা।
যদি রিভিশন চাওয়া হয়, তাহলে রিভিউ পড়ে পয়েন্ট আকারে তালিকা
করে ফেলেন, রিভিউয়ারেরা কী চাচ্ছেন তার ওপর। এরপর এক এক করে
সেই ব্যাপারগুলোর নিষ্পত্তি করুন। পরে যখন পরিমার্জিত পেপারটি জমা
দেবেন, তখন কীভাবে রিভিউয়ারদের আপত্তির জবাব দিচ্ছেন, তা আলাদা
করে জমা দিতে হয়, তাই খুব খেয়াল করে এই কাজটা করুন।

জার্নালে প্রকাশের পরবর্তী কাজ

আপনার নিবন্ধটি যদি জার্নালে প্রকাশের অনুমোদন পায়, তাহলে জলদি
আপনার পাবলিকেশন লিস্ট, ওয়েবসাইট ও সিভিতে তা যোগ করুন। তার
পাশাপাশি আপনার গবেষণা এলাকার লোকজন যাতে এই পেপারের কথা
জানে, এর জন্য কিছু কাজ করুন। হতে পারে, আপনার পেপারের ওপরে
একটি ব্লগ পোস্ট লিখুন। অথবা আপনার বিষয়ের অন্যান্য গবেষকের কাছে
এই পেপারের একটি কপি পাঠান। আপনার সিভিতে বা ওয়েবসাইটে
পেপারটির কথা যোগ করার সময়ে জার্নালটির ইমপ্র্যাক্ট ফ্যাক্টরের কথা
লিখে রাখতে ভুলবেন না। আর এ পেপারটি কে কোথায় সাইট করছে,
গুগল স্কলারের মাধ্যমে তাও খেয়াল রাখুন। এতে করে আপনার গবেষণার
ওপরে নির্ভর করে পরবর্তীতে আর কী কী সম্পর্কিত কাজ বা গবেষণা
হচ্ছে, তা জানতে পারবেন।

ভালো প্রেজেন্টেশন বা লেকচার দেবেন যেভাবে

আপনার লেকচার শুনে কি দর্শক হাই তোলে? ফেসবুক চেক করতে চলে যায়? অথবা আপনার নিজের হাঁটু কাঁপে ভয়ে? তাহলে পড়তে থাকেন, এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কী করে ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায়, তার নানা কায়দাকৌশল।

রিসার্চ বা গবেষণার ফলাফল বা যেকোনো প্রজেক্ট রিপোর্ট বা সেমিনারের সঙ্গে অবধারিতভাবে যেটা জড়িত তা হলো, প্রেজেন্টেশন দেওয়া। এক কালে ব্লাকবোর্ড বা স্লাইড প্রজেক্টর দিয়ে সেটা করা হতো। কিন্তু এখন সেটার প্রায় একমাত্র মাধ্যম হলো স্লাইড প্রেজেন্ট করা— পাওয়ারপয়েন্ট, পিডিএফ, ওপেন অফিস, অ্যাপলের প্রেজেন্টেশন টুল অথবা হালের নতুন সংযোজন প্রেজি (prezi)। কিন্তু প্রেজেন্টেশনের টুলটা মুখ্য নয়, সবার যেখানে সমস্যা হয়, সেটা হলো প্রেজেন্টেশন তৈরি করা। আর মানুষের সামনে সেটা (নির্ভয়ে) উপস্থাপন করা।

আসুন জেনে নিই, প্রেজেন্টেশন বানানোর কিছু সহজ কিন্তু কার্যকর টিপস।

সময়ের হিসাব করুন সবার আগে

কোনো বিষয়ে অনেক কিছু জানলে একটা প্রবণতা হলো সবকিছু উগড়ে দেওয়া বিশাল লম্বা প্রেজেন্টেশন বানিয়ে। এর অবধারিত পরিণাম হলো সময়ের মধ্যে লেকচার শেষ করতে না পারা। ফলে অনেক কিছু বাদ দিয়ে শেষের দিকে তাড়াতড়া করে শেষ করা বা শেষ করতে না পারা।

তাই সবার আগের কাজ হলো স্লাইড কয়টা হবে তা ঠিক করা। একটা খুব সহজ ফরমুলা হলো, টাইটেল আর অন্য কিছু লিস্ট মার্কা স্লাইড বাদে অন্য স্লাইডগুলোর জন্য স্লাইডপিচু এক বা দুই মিনিট বরাদ্দ করা। অর্থাৎ আপনার সময় যদি ১৫ মিনিট হয়, তাহলে বড়জোর আটটা স্লাইড বানাবেন। এর

বেশি বানালে আপনার স্লাইডগুলোতে তথ্য কমই থাকবে অথবা আপনি শেষ করতে পারবেন না এই সময়ে।

ছবি কথা বলে

A picture is worth a thousand words...

হানিফ সংকেতের ইত্যাদির সঙ্গে অমুক বিষয়ের একাডেমিক লেকচারের পার্থক্য কী? (অমুক বললাম, কারণ কোনো বিষয়ের নাম বলে কাউকে রাগাতে চাই না)।

যেকোনো সেমিনারে গেলেই দেখবেন, হাত-পা নেড়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রেজেন্টার অনেক কিছু বলে যাচ্ছেন। কিছু দর্শক মনোযোগ (আসল) দিয়েই দেখছে। বাকিরা হাই তুলছে, কয়েকজন ঘুমাচ্ছে। আর বাকিরা ফোন বা কম্পিউটারে মেইল বা ফেসবুক চেক করছে।

এর কারণটা কী? ইত্যাদির সময় তো এরাই কেউ ঘুমাবেন এরকম।

কারণটা হলো প্রেজেন্টেশন এতই বোরিং যে যারা ঘুম ঘুমভাব ছিল, তারা ঘুমিয়ে গেছে। আর যারা ছিল সজাগ, তাদেরও ঘুম ঘুমভাব হয়েছে।

বোরিং হয় কখন? যখন স্লাইড ভর্তি করে একগাদা লেখা দিয়ে দেন। আর তার পর রিডিং পড়তে থাকেন। এটা খুব কমন একটা ঘটনা, বিশেষ করে নতুন নতুন করে যারা প্রেজেন্টেশন বানান, তারা এ কাজটা করেন।

থামুন! একটু ভেবে দেখুন লেকচার কেন মানুষ দেখতে গেছে। স্ক্রিনের লেখাতেই যদি সব ভরে দেওয়া যেত, তাহলে কিন্তু আপনার উপস্থিতিরই দরকার ছিল না। স্লাইড শো দিলেই হতো। প্রেজেন্টারের উপস্থিতির কারণ হলো লেকচারের বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়া, ‘কথা বলে, নিজের ভাষায়।’ সেটা করতে হলে স্লাইডে কথা থাকবে কম, সে কথাগুলো বলবেন আপনি।

তাহলে ইন্টারেষ্টিং স্লাইড কীভাবে বানাবেন? প্রতি স্লাইডে একটা ছবি দিন। ডানে ছবি, বাঁয়ে সেই স্লাইডের বিষয়ের ওপরে অল্প কিছু কথা। এরপর স্লাইডটা দেখিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিজে বলুন।

এর ফলটা হবে চমৎকার। স্ক্রিনের একগাদা লেখা দিলে দর্শকেরা আপনার দিকে না তাকিয়ে সে লেখাই পড়তে থাকে। এরচেয়ে ছবিটা দিলে সেই ছবি

থেকে কিছু আইডিয়া পেতে পারে শুরুতেই। আর বাকিটা সময় আপনার কথাগুলো মনোযোগ দিয়েই শুনবে।

কী ছবি? মনে রাখুন, আপনার মূল লক্ষ্য হলো আইডিয়াটা বোঝানো। তাই সেই আইডিয়াকে তুলে ধরে এমন ছবি দিন। যেমন— ধরা যাক কোন নতুন সিস্টেমের পারফরম্যান্স অথবা দাম কম, সেটা বোঝাচ্ছেন। এক বঙ্গ টাকার ছবি দিন। এক মুহূর্তেই সবাই বুঝে যাবে কিসের কথা বলছেন। আমাদের মন্তিকের পক্ষে ছবি প্রসেস করা অনেক সহজ, রাশি রাশি লেখার চেয়ে।

বাদ দিন গতানুগতিক ফরম্যাট

পাওয়ারপয়েন্টে লেখার বড় সমস্যা হলো, সেই গবাঁধা বুলেটপয়েন্ট মার্কা স্লাইড বানিয়ে ফেলে সবাই। ফলে রিসার্চ প্রেজেন্টেশনকে বিজনেস প্রেজেন্টেশনের মতো লাগে।

কিন্তু সেটা আসলে আপনার করতেই হবে এমন কিন্তু কথা নাই। নিজের মতো করে লিখুন, বুলেটপয়েন্ট বাদ দিয়ে। এ ক্ষেত্রে একটা ভালো সাজেশন হলো স্লাইডের টাইটেলে এক-দুইটা শব্দ না লিখে ওই স্লাইডের বর্ণনা দিয়ে বা যা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা লিখুন।

ধরা যাক, আপনার স্লাইডে একটা গ্রাফ দেখিয়ে বলছেন, আপনার বানানো সিস্টেম ১০ শতাংশ দ্রুত কাজ করে। এ ক্ষেত্রে স্লাইডের টাইটেল Results না দিয়ে সেখানে এভাবে লিখতে পারেন— Results show that system X works 10% faster.

আর বিস্তারিত কথা নিজে মুখে বলেন। এতে করে আপনার স্লাইডের প্রথম অংশ মানে টাইটেল দেখেই সবাই শুরুতে ধারণা পাবে এই স্লাইডের মোদা কথা কী, সেটা।)

লেখার ফন্ট বা স্লাইডের রং, ওরফে হিমু সিনড্রোম

নতুন নতুন ওয়েবসাইট বানানো শিখেছে, এমন কারও সাইটে গেলে একটা ব্যাপার দেখবেন অনেক সময়, ক্যাটক্যাটে সব রং দিয়ে ভর্তি। স্লাইডের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। বাহারি সব টেম্পলেট দিয়ে আর ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ভরিয়ে ফেলে অনেকে, বেশি রং = বেশি ভাব— এই ফরমুলা অনুসারে।

হিমু যেমন কড়া হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে ঘোরে, সেরকম কড়া নানা রঙে
ভরপুর থাকে এসব স্লাইড।

এক্ষুনি থামুন!! অতিরিক্ত বাহারি স্লাইড আসলে আপনার স্লাইডগুলোকেই
অপাঠযোগ্য বানিয়ে দিচ্ছে।

খেয়াল করুন, স্লাইড কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখানো হবে প্রজেক্টরে।
কম্পিউটারের ক্রিনে যা দেখছেন, প্রজেক্টরে কিন্তু রং বা উজ্জ্বলতা,
কোনোটাই হবে না একই রকমের। দিলেন নীল, দেখাচ্ছে সবজেটে,
লালকে দেখাচ্ছে কমলা— এরকম হবেই। কাজেই অতিরিক্ত রং বাদ দিন।
ব্যবহার করুন কেবল বেসিক কালার। যেমন, কালো, সাদা, উজ্জ্বল লাল,
গাঢ় নীল, গাঢ় সবুজ— এগুলো। আর খেয়াল রাখবেন, অনেক সময়েই
প্রেজেন্টেশন দেবেন দিনের আলোয়। কাজেই এমন যদি ব্যাকগ্রাউন্ড আর
ফন্ট কালার দেন, যাতে দিনের আলোয় সেটার কনট্রাস্ট বেশি না, রুমে
আলো বেশি থাকলেই ঝাপসা হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু আপনার স্লাইড
অনেকেই দেখতে পাবে না। স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড ডার্ক। আর ফন্ট সাদা
ব্যবহার না করাই ভালো। হলুদ রং গায়েহলুদে বা বাসন্ত অনুষ্ঠানে মানায়,
কিন্তু স্লাইডে না, সেটা প্রজেক্টরে প্রজেক্ট করার পরে আদৌ যায় না দেখা।

তবে হ্যাঁ, স্লাইডের মধ্যে কোনো শব্দকে নজরে আনতে চাইলে টেক্সট
কালার কালো হলেও ওই শব্দটাকে উজ্জ্বল কোনো রং করে দিন। স্লাইডের
টাইটেল উজ্জ্বল রঙে রাখতে পারেন।

স্লাইডের ফন্ট ও সাইজ / চল্লিশ পেরোলেই চালসে...

আমার পিএইচডি অ্যাডভাইজর প্রফেসর মেরিঅ্যান উইল্সলেটকে একবার
আগ্রহের সঙ্গে এক স্লাইড দেখাচ্ছিলাম। দুই স্লাইড যাওয়ার পরই উনি
শুধরে দিলেন, স্লাইডের ফন্ট সাইজ খুবই ছোট বলে।

আমি পড়লাম আকাশ থেকে। কই, আমি তো বিশাল সব ফন্ট দেখি,
তাহলে ছোট হয় কীভাবে?

‘তোমার বয়স তো ৩০ পেরোয়নি, তাই তুমি বুঝবে না।’ আমার প্রফেসর
ব্যাখ্যাটা দিলেন এভাবে— কম বয়সে গুঁড়ি গুঁড়ি টাইপের ছোট ফন্ট
অনেক দূর থেকে দেখতে পেলেও বয়স ৩০ পেরোলেই অধিকাংশ মানুষ
ছোট লেখা দেখতে পারে না বা করে না পছন্দ। আর আপনি যাদের

(বস/প্রফেসর/কনফারেন্স) প্রেজেন্টেশন দেখাবেন, তারা অনেকেই হবে বেশ বয়স্ক, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। আবার অনেকে বসবে রংমের পেছনের দিকে। এদের পক্ষে স্লাইডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লেখা দেখাটা প্রায় অসম্ভব।

তাই স্লাইড বানাতে গেলে সবার কথা খেয়াল রাখুন। স্লাইড প্রজেক্টরে দিয়ে রংমের পেছনের দিক থেকে দেখা যায় কি না, সেরকম সাইজ বেছে নিন। মোটামুটিভাবে এক স্লাইডে পাঁচ-ছয় লাইনের বেশি আটার কথা না, এর বেশি হলেই বুঝতে হবে ফন্ট ছোট করে ফেলেছেন। সেটা না করে দরকার হলে দুই স্লাইডে রাখুন।

আর ফন্ট বাছার সময় ভগিচগি টাইপের ভাবের ফন্ট ব্যবহার না করে স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট, যেমন— Arial, Helvetica, Times New Roman, এরকম ব্যবহার করুন। আঁকাবাঁকা ফন্ট পড়া কষ্ট।

কথা নয় : ছবি / less is more

স্লাইডে কথা কম বলাই ভালো। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো যা বলতে চান লেকচারে, তার সবটাই স্লাইডে ভরে দেওয়ার অপচেষ্টা না করা। ২ নম্বর পয়েন্টে (আগের লেখায়) এটা বলেছিলাম, কিন্তু আবারও অন্যভাবে বলি, মানুষ আপনার লেকচার শুনতে এসেছে, পড়তে না। পড়ার দরকার হলে আপনার কথা বলার তো দরকার ছিল না আদৌ। তাই মূল স্লাইডে সবকিছু ভরে না দিয়ে ছবি দিয়ে কথায় ব্যাখ্যা করুন। তবে আরেকটা ট্রিক শিখিয়ে দিই, backup স্লাইড রাখুন। কারও যদি আপনার কথায় জিনিসটা বুঝতে কষ্ট হয়, তাহলে যাতে সব বিস্তারিত কিছু লেখাসহ এক বা একাধিক স্লাইড বা ছবি বা চার্ট বা ডেটা লেকচারের পেছনে রাখেন, যাতে দরকারমতো সেটা দেখাতে পারেন।

স্লাইডের ফরম্যাট / শেষ হইয়াও হইল না শেষ?

আগের পয়েন্টের ধারাবাহিকতায় স্লাইডের ক্রম নিয়ে কিছু বলি। আপনার লেকচারের স্লাইডগুলোর ক্রম বানান অনেকটা এরকম—

- টাইটেল স্লাইড (আপনার লেকচার টাইটেল, ইন্টারেক্ষিং ও সম্পর্কিত কিছু ছবি, আপনার নামধাম-পরিচয়, ইমেইল),

- ওভারভিউ
- লেকচারের বিস্তারিত স্লাইড
- উপসংহার
- সমাপ্তি স্লাইড (এখানে আপনার লেকচারের মোদা কথাটা এক বা দুই বাকেয়ে লিখুন এবং ‘ধন্যবাদ’ দিন)
- ব্যাকআপ স্লাইড (মূল আলোচনায় বাদ দিয়েছেন, কিন্তু আপনার গবেষণার অংশ ছিল এবং দর্শক প্রশ্ন করতে পারে, এমন সবকিছু এখানে থাকবে, যাতে কেউ প্রশ্ন করলে এসব স্লাইড দেখাতে পারেন)

সমাপ্তি স্লাইডে বেশি কিছু না থাকলেও এটা বেশ দরকারি। আপনার লেকচারকে সামারাইজ করে এমন একটা ছবি এবং এক-দুই বাকেয়ে লিখুন। আপনার নাম বা ইমেইল সেটা দিন। এখানে এসে থামবেন, কাজেই প্রশ্নোত্তরের সময় এই স্লাইডটাই স্ক্রিনে থাকবে। আর পাঠকের এটাই বেশি মনে থাকবে। কাজেই সময় নিয়ে এটা বানান।

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন প্রেজেন্টেশন ও বক্তৃতা

বহুকাল আগের কথা, প্রায় ২০ বছর আগে কোনো একদিন ডাক পড়ল বিটিভির স্টেশনে, এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলের কারণে শিক্ষাবিষয়ক এক অনুষ্ঠানে। সব বোর্ডের প্রথম কয়েকজনের সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতায় কুমিল্লা বোর্ডের পালা।

আমি পড়লাম বিপাকে। সবার সামনে বা ক্যামেরার সামনে কথা বলার একেবারেই অভ্যাস, সাহস, কোনোটাই নাই। অনেক কষ্টে বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব মুখস্থ, ঠোঁটস্থ করে গেলাম। কিন্তু বিধি বাম। ক্যামেরার ফোকাস যখনই পড়ল আমার ওপর, মাথার ভেতর থেকে গেল সব জবাব হারিয়ে, অনেক কষ্টে চিংচি করে যা বললাম, তা পরে টিভিতে দেখে আমার নিজেরই মায়া হলো। আহা, কী কষ্টেই না বেচারা কথা বলছে!

বাংলাদেশের কুল-কলেজে পড়াশোনাটা অনেকটা একমুখী, মানে শিক্ষক বলেন, ছাত্রা শোনে। বড়জোর বেতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়া বলা— এই যা। কিন্তু পাবলিক স্পিকিং, মানে অনেক লোকের সামনে কথা বলা, সে যেন কেবল বিতার্কিক কিংবা রাজনীতিবিদদের জন্যই বরাদ্দ।

কিন্তু গবেষক বা উচ্চশিক্ষার্থী হতে হলে নিজের কাজকে সবার সামনে তুলে ধরাটা খুব জরুরি। কেবল তা-ই নয়, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, সবাইকে প্রায় কোনো না-কোনো সময়ে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। রুম ভর্তি লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়। আজকের এ লেখাটা আপনাদের জন্যই, যাদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে কাপে হাঁটু, মাথা ঘোরে। আর গলাটা শুকিয়ে তোতলাতে থাকেন।

২০ বছর পর আমি আজ কথা বেচে খাই, মানে একজন শিক্ষক বা গবেষক হিসেবে সপ্তাহে প্রায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা টানা কথা বলি এক রূম ভর্তি মানুষের সামনে। আমি এখন যেকোনো বিষয়ে, এমনকি যে বিষয়ে হালকা জানি, তার ওপরেও ঘণ্টা খানেক কথা বলতে পারব, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই। অধ্যাপনা পেশার এ এক অঙ্গাঙ্গি অংশ। কিন্তু কীভাবে পাল্টালাম নিজেকে? আসুন, দেখা যাক।

১) কী বলবেন, ঠিক করে নিন সবার আগে। আপনি যদি জানেন কিসের ওপরে কথা বলতে হবে, তাহলে কথা বলার আগে চিন্তা করে নিন। কী বলবেন, কেন বলবেন, কীভাবে বলবেন, আগেই ভেবে রাখুন। স্লাইড প্রেজেন্টেশন যদি করেন, তাহলে ‘প্রেজেন্টার’ মোডে করুন। আর দরকার হলে প্রতি স্লাইডের তলায় নোট লিখে রাখুন। না হলে নোট কার্ডে কিছু লিখে রাখুন।

২) প্রস্তুতি : প্র্যাকটিসের ওপরে আর কিছুই নাই। অবশ্যই পারলে আগে থেকে অনুশীলন করে রাখবেন। একাডেমিক বা চাকরির প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে অবশ্যই বন্ধুবন্ধব বা অন্তত এক-দুজনের সামনে প্র্যাকটিস সেশন করবেন। কারণ সেটা না করলে মূল সেশনে আপনার সমস্যা হবেই। বিশেষ করে, সময়ের অভাব— কথা বলার যেটুকু সময় পাবেন, তাতে সব কথা বলতে হলে আপনাকে অনুশীলন করে নিতে হবেই।

৩) মুদ্রাদোষ : আপনি হয়তো নিজেও বুঝতে পারছেন না আপনি কথা বলার সময়ে অন্তুত কী সব কাজ করেন। আমার স্কুলের এক স্যার ক্লাসে পড়ানোর সময় একটু পরে পরেই মুখ খিচতেন অন্তুতভাবে। আমরা একবার টালি কেটে হিসাব করে বের করেছিলাম, উনি প্রায় ৮০ বার এটা করেছেন। আপনার অনুশীলন সেশনের দর্শকদের বলুন, এগুলো খেয়াল করতে, কোনো ভঙ্গি বা শব্দ আপনি কি বারবার ব্যবহার করছেন কি না। সম্ভব হলে ভিডিও করে রাখুন বা আয়নার সামনে কথা বলার অভ্যাস করুন। নিজেকে নিজের চোখে দেখলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।

৪) দর্শকদের দিকে তাকানো : কথা বলার সময় এটা খুব দরকারি। দয়া করে ছাদের কড়ি কাঠ কিংবা মাইক্রোফোনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না।

আপনার চোখ বোলাতে থাকেন সবদিকেই। বিশেষ কোনো দর্শকের দিকে বারবার তাকাবেন না (ক্ষেত্রবিশেষে দর্শকেরা কিন্তু আপনার চরিত্র নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে)।

৫) ভয় কাটানো : প্রতি দর্শকমণ্ডলীতেই কেউ না কেউ থাকে, যে আপনার সব কথায় হাসি মুখে বুঝতে পারছে বা একমত হচ্ছে। সব সময় তাদের দিকে তাকাবেন না বটে, কিন্তু আপনার ভয় করলেই তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেন। মনে সাহস আসবে।

৬) নার্ভাস হবেন না : ভয় লাগলে ভাববেন, আপনাকে নার্ভাস দেখালে বা স্পিচ ভালো না হলে কী হবে? লোকজন আপনাকে কি মারবে নাকি? তাহলে আর ভয়ের কী আছে? তা ছাড়া একটু পরেই তো স্পিচ শেষ, কেটে পড়তে পারবেন।

৭) একঘেয়েমি কাটান : স্পিচ দেওয়ার একটা খুব দরকারি ব্যাপার হলো একঘেয়েমি কাটানো। রোবটের মতো করে এক সুরে, এক লয়ে কথা বলবেন না। দর্শক টেপ রেকর্ডিং শুনতে আসেনি। তাই কথা বলুন আলাপচারিতার মতো করে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার সময় আমাদের গলার স্বর কিন্তু ওঠানামা করে। স্পিচের ক্ষেত্রেও তাই করুন।

৮) স্থির হয়ে থাকবেন না : এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মূর্তি বনে থাকবেন না। একটু নড়াচড়া করুন। হাত নাড়ুন।

৯) রিডিং পড়বেন না : স্লাইডের দিকে তাকিয়ে রিডিং পড়বেন না। অথবা আপনার হাতে লেখা বক্তৃতার কপি লাইন ধরে ধরে পড়বেন না। অত্যন্ত বিরক্তিকর।

১০) মুখস্থ করা বাদ দিন : সবশেষে আবারও বলি, ভয় পাবেন না। আর প্রতিটি লাইন মুখস্থ করে যাবেন না। মুখস্থ করে গেলে আপনার দু-একটা লাইন নার্ভাসনেসের কারণে মিস যাবে নিশ্চিত। তখন আরও নার্ভাস হবেন। তাই বিষয়টা বুঝে নিয়ে কথা বলুন। হড়বড় করে কথা বলবেন না। আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে বলুন। বিষয়টা বোঝা থাকলে আপনি অবশ্যই সেটা পারবেন। সবার দিকে তাকাতে ভয় লাগলে যা ৪ নম্বরে বলেছি, মানে এক

জায়গায় চোখ না আটকে রেখে চোখ পুরো রূমে ঘোরানো, সেটা আস্তে
আস্তে করেন। থামুন। বিরতি নিন দুই-তিন সেকেণ্ডের। আলাপচারিতা
যেভাবে করেন, সেভাবেই কথা বলুন।

সহজভাবে নিন (Take it easy), বুক ভরে শ্বাস নিন, বিরতি দিয়ে একটু
পানি খেয়ে নিন। ভয়ের কিছু নাই।

এভাবেই দিন আপনার প্রেজেন্টেশন কিংবা অন্য বক্তৃতা। আর করে দিন
বাজিমাত।

বইয়ের বাকি অংশ
পড়তে রহিটি কিমুন